

দূরের বন্দর

প্রফুল্ল রায়



ক্যালকাটা বুক ক্লাব প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ মহালয়া ১৩৬৩
প্রকাশক
জ্যোতিপ্রসাদ বসু
ক্যালকাটা বুক ক্লাব প্রাইভেট লিমিটেড
৮৯, হ্যারিসন রোড কলিকাতা—৭
মুদ্রাকর
সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রতিভা আর্ট প্রেস
১১২এ, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯
প্রচ্ছদ
লিম
ব্লক
ব্লকম্যান (প্রোসেস)
প্রচ্ছদমুদ্রণ
দি নিউ প্রাইমা প্রেস
বাঁধাই
এশিয়াটিক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
দাম আড়াই টাকা

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু—

'দূরের বন্দর' আমার সতের বছর বয়সের রচনা, আমার প্রথম উপন্যাস। সে দিন সাহিত্য ভাবনা কী শিল্পচিন্তা পরিণত ছিল না। পদ্মা-মেঘনা-ইলসার সেই জলবাংলা, চর-প্রান্তর কী ধানবনের ফাঁকে ফাঁকে সেই পরিশ্রমী মানুষগুলির সুখী আর সহজ জীবনবোধ আমার উত্তরকৈশোর দিনগুলিকে একটি স্বপ্নময় আনন্দে আবিষ্ট করে রেখেছিল। 'দূরের বন্দর' সেই স্বপ্নময় আনন্দের, সেই অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছায়া।

গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি শুনেছিলেন শ্রীরমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রুফ সংশোধন করেছেন অসমবয়সী বন্ধু শ্রীপ্যারী মোহন দাস। তাঁকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ।

বাটানগর ॥ মহালয়া
১৩৬৩ ॥

প্রফুল্ল রায়

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

নতুন দিন

তাসের মিনার

নাগমতী

পূর্ব পার্বতী

কন্যাকুমারী (যন্ত্রস্থ)

ছিটেবেড়ার ফাঁকফোকরের মধ্য দিয়ে দুটো চোখ যখন তখন ঘুরপাক খায়। স্তাকা লাগে যেন কপিলার কাঁচা আনাজের মত তাজা চামড়ায়। উনুন থেকে জলন্ত একটা কাঠ নিয়ে উঁচিয়ে ধরে কপিলা, বলে—"যা-যা বান্দা, মনিবের তামুক ভইর‍্যা দে গিয়া।"

পাকের ঘরের ওপাশে থনথনে মানকচুর জঙ্গল, নতুন বর্ষার আশীর্বাদে বেশ স্বাস্থ্যঘন হয়ে উঠেছে। চট করে চোখজোড়া সরে যায় ওখান থেকে। কপিলা তখনও গন গন করতে থাকে—"আবার আইসো, ড্যাবড্যাবা চোখে দিমু পোড়া কাঠ গুইজ্যা।"

উনুনে মেটে পাতিলে ভাত ফুটছে। আর সঙ্গে সঙ্গে টগবগ করে চলেছে কপিলার মনটা; "দিনরাইত খড়ম-পিটানি খায় মনিবের, তার নজর-খান একেবারে গাছের আগায়; যা যা পেত্নীর পিছনে ঘুরপাক খা গিয়া।"

নিজের শরীরটা একবার আদুল করে দেখে নেয় কপিলা। একটা তরল খুশির ফিনকি ফোটে চোখে আর ঠোঁটের আনাচে-কানাচে। মুখের মানচিত্রে একটা ঘন কালো তিলের দ্বীপ, তারই তেপান্তরে দিশা হারিয়ে ফেলে কাঁচা বয়সের ছেলে ছোকরারা।

ভাতের হাঁড়ির সরার ফাঁক দিয়ে হাল্কা একটা লঘুস্বাদ গন্ধ উঠছে ভুরভুর করে; আর তার সঙ্গে সঙ্গে কপিলার আলগোছ মনটা ফুর ফুর করে উড়াল দেয়? ভারি সচেতন সে তার সুডৌল যৌবনকে নিয়ে।

ভাতের পাতিলটা নামিয়ে পাকের ঘরটা থেকে বেরিয়ে এল কপিলা। মানকচু জঙ্গলের কিনারা থেকে মোথরা ঝোপের এলাকা শুরু, তার-

পরেই একটা নিথর খালের ছলছলান জলধারা। মোথরার দীঘল দীঘল ডাঁটাগুলোর ফাঁক দিয়ে বেশ দেখা যায়। একটা কোষ নৌকা বাঁধা রয়েছে পারের কাউ গাছটার শিকড়ে। পাটাতনের ওপর এখনও ঠায় বসে আছে। কপিলার চোখের তারায় এক ঝলক তাজা আগুন ঝিলিক মেরে গেল। কাপড়টা কোমরে আঁটসাট করে জড়িয়ে কপিলা এগিয়ে এল কোষ নৌকাটার দিকে; বলে—"কি রে বান্দা, তোর মনিব তো খড়ম শানাইয়া রাখছে। যা, যা, শিগ্‌গির পিঠ পাইতা দে গিয়া।"

পায়ের বুড়ো আঙুলটা নাচাতে নাচাতে নিতাই আকাশ-পাতাল একাকার করে ফেলছিল মনের চক্ররেখায়, বলে—"কি কইলি কপিলা! মনিব আমারে খড়ম দিয়া মারে?"

মচকানো হাসির একটা তুফান তিরতিরিয়ে গড়িয়ে গেল কপিলার পান-রাঙানো ঠোঁটের ওপর দিয়ে। বলে—"না, পিরীত করে, পিরহানটা তুইল্যা দেখা দেখি। এইখানে কি! কলুবাড়ী থিকা তেল লইয়্যা যা সোয়া সের, পিঠে তো ডলতে হইব। যা, যা।"

"যামু না—কিছুতে না।"

"ক্যান?"

"তোরে বড় মনে ধরছে কপিলা।" ড্যাবাড্যাবা দুটো চোখ তুলে ধরে নিতাই।

"আ লো আমার নাগর লো, যা যা বান্দা—ঐ যে হাইল্যা চাষা আছে ছিদাম, তার কানা বইনটার লগে পিরীত কর গিয়া, নজরখান মাটিতে নামা আসমান থিকা।"

"তুই বড় স্যাকা দিয়া কথা কইস কপিলা, ভারি ব্যথা লাগে।"

"খড়মের ঘা'র থিকাও বেশী লাগে! যা-যা তোর গায়ে যা গন্ধ!"

"চত্তির মাসে গিরিগঞ্জের মেলা থিকা গন্ধসাবান আমুম, গা থিকা তখন বাস বাইর হইব ভুর ভুর কইর‍্যা। সেই সময় আমুম তোর কাছে। অখন যাই।"

আচমকা ডিঙির রশি খুলে বৈঠা চালাতে থাকে নিতাই। ছলছলিয়ে এগিয়ে চলে কোষ নৌকাখানা।

খালের দূর বাঁক থেকে ভেসে এল নিতাইর অনসুরা গলার একটা বেতরিবৎ কলি—

বউন্যা ফুলের মালা গাইথা ও সুন্দরী
দিব তোমার গলেতে—
হে সোনার বরণ রাজকইন্যা—
ময়ূরপঙ্খী নাও ভিড়িল ঘাটে গো
ও আমার পরাণবন্ধু রে—

হোক অপটু তবু তো পুরুষের গলা, বলিষ্ঠ বুকের কেন্দ্রকোণ থেকে ভেসে আসছে। কি জানি কি ছিল নিতাইর গানে, চনমন করে উঠল কপিলার মনটা; কাউগাছটার পিঠে ঠেসান দিয়ে কান দুটো সজাগ করে রাখে সে। অনেক দূর থেকে তখনও মাতলা বাতাসের সওয়ার হ'য়ে ভেসে আসছে—

হে সোনার বরণ রাজকইন্যা—

নতুন বর্ষার জল এসেছে খালে। খলখলিয়ে ওঠে জলের কলধ্বনি। খালের কিনারে নরম মাটির জোল থেকে ফনফনিয়ে উঠেছিল ঢোলকলমি, কেয়োঠুঁটি আর শেয়াকুলের ঝুপসি। জলের জোর ছিল না কচুরিপানার কেরামতিতে। মরা খাল। পায়ের পাতা ডোবে না, এমনি জল—তার ওপর কচুরি আর বুনো কলমির ঠাসবুনন। কালকাসুন্দের ঝোপঝাড

ঠেলে নমশূদ্র পাড়ার বৌঝিরা গীমে শাক তুলে নিয়ে যেত, হাতিয়ে হাতিয়ে খালের পাঁক থেকে ধরত কচি শিঙি আর খল্‌সে, মেনি মাছ আর তিত্‌ পুঁঠি। সামান্য আয়াসের ফসল—মাটিজলের দাক্ষিণ্য সব। তাড়া দেবার কেউ নেই। সবারই এতে সমান মালিকানা।

পারানির সাঁকো আছে একটা; খালের একটা বাঁক ঘুরে—ইসমাইল চৌকিদারের বাড়ীর লাগোয়া। নতুন বয়রা বাঁশের সাঁকো। তার তলা দিয়েই নিতাইএর কোষ নৌকাটা 'সোনার বরণ রাজকইন্যা'র জন্য 'বউন্যা ফুলের' সন্ধানে কোন এক তন্দ্রাঘন দিগন্তে উধাও হয়ে গিয়েছে। এখন আর গান নেই—শুধু মেঘনার তেজী জলের জলতরঙ্গ বেজে আশ্‌-শেওড়া আর কাশ জঙ্গলের ওপর দিয়ে; মিঠে একটা রিমঝিম নেশা ছড়িয়ে যাচ্ছে যেন। খুশির খুসবো বইছে জলের ফুল্‌কি-ফিন্‌কির বেদিশা উল্লাসে।

কাউ গাছটার পিঠে ঠেসান দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে কপিলা—যাযাবর দুটো চোখ বিচিত্র এক নেশায় মাখামাখি হয়ে রয়েছে।

এতক্ষণ খেয়াল ছিল না কপিলার। ইতিমধ্যে কখন যেন তুফানী সাঁকোটার ওপর এসে উঠেছে। কোমরের খাজে একটা মাটির কলসী। রাঙা টুকটুকে একখানা ডুরে শাড়ী দেহের মোলায়েম রেখায় রেখায় জড়ানো। রাঙা ঠোঁট দুটোর আনাচে কানাচে মিহি হাসির একঝলক তন্দ্রা ছড়িয়ে রয়েছে। চলন নয় তো—যেন গান আর গমকের সুতো দিয়ে বোনা একটা মধুর ছন্দ। এগিয়ে এসে বলে—"আলো সই, মনের কথাখান কই?"

কপিলাও কাঁচা রঙ্গ করে—"ক'বি কার কাছে, তোর সোয়ামী তো গেছে ধান নিড়ান দিতে সেই কোন্ ভোর সকালে।"

তুফানীর সারা শরীরে পাহাড়ী গাঙের মত ধারালো যৌবন—তাতে

বন্যার আমেজ তুলে বলে—"আমি তো বুড়ী হইয়া গেছি, ওই সব রস কাচা বয়সের। ওই সব রঙ্গ হইল নয়া ঘরন্তীর। বয়স হইল কত ? খেয়াল আছে ? যাউক সে কথা, আমি ডউয়া গাছটার পিছ থেইকা সব দেখছি, নিতাই বুঝি ঠোনা দিয়া গেল দুই গালে।"

কপিলা আগের কথাটার হাল চেপে ধরে।—"বুড়ী হইয়া গেছস্, এক বিয়ানেই বুড়ী ; মালো ! গালের পিঠে হাত রাখে কপিলা।

তুফানী ঘাড় বাঁকিয়ে বলে—"তোর মুখে আগুন পড়ুক—আমি কি ক'ই, নিতাই কইল কি ? মনে লাগছে বড়, না রে !"

"তোর মাথা। যা, যা। ঘরে যা। সোয়ামী আইসা না দেখলে ভিরমি খাইব।"

সহসা তুফানী কোমরের সন্ধি থেকে মাটির কলসীটা নামিয়ে রাখল কাউ গাছটার নীচে। তারপর চোখ নাচিয়ে আয়না বিবির মিঠে একটা ছড়া ছড়িয়ে দেয় কপিলার কানে—

বইস্যা কান্দে ফুলের ভ্রমর, উইড়া কান্দে কাগা।
শিশুকালে করলাম পিরীত যৌবনকালে দাগা ॥
রে বন্ধু যৌবনকালে দাগা ॥

সুজন চিন্তা পিরীত করা বড় বিষম লেঠা।
ভাল ফুল তুলতে গেলে অঙ্গে লাগে কাঁটা ॥
রে বন্ধু অঙ্গে লাগে কাঁটা ॥

কপিলা আলগোছ রাগের ভঙ্গি করে—"গলায় দড়ি দে, কলস তো লগে আছেই।"

তুফানী থামে না, গলা চড়িয়ে গাইতে থাকে—

লাজ বাসি মনের কথা কইতে নাই সে পারি।

বুকেতে লাইগাছে বন্ধু দেখাই কারে চিরি ॥
রে বন্ধু দেখাই কারে চিরি ॥
কইতে নারি মনের কথা মা ও বাপের কাছে।
লীলারই বাতাসে আমার অন্তর পুইড়া গেছে ॥
রে বন্ধু অন্তর পুইড়া গেছে ॥

কলসীটা আবার কাঁখে তুলে নিল তুফানী। গমকের একটা ঘূর্ণি তুলে এগিয়ে গেল খানিকটা, তারপর পিছনদিকে চোখদুটো ঘুরিয়ে বলে—

"সই লো, যাই অখন, পোলাটায় কান্দে।"

"যা ; পোলা কান্দে না পোলার বাপে!"

"তোর মুখে আগুন।"

তুফানী নারকেলগুঁড়ি দিয়ে বাঁধানো খালের ঘাটে গিয়ে নামলো। রাঙা ডুরে শাড়ীটার ভাঁজে ভাঁজে স্নিগ্ধ আমেজে বর্ষার রোদ ঝিলমিল করছে।

কপিলাও আটকিরে ঝোপটার পাশ দিয়ে পাকের ঘরের পথটা ধরেছে।

বর্ষাস্নিগ্ধ বিকাল। জলবৃষ্টির নেশা-মাখানো খানিকটা তরল রোদ পশ্চিমদিকের তেঁতুল গাছটার পাতায় পাতায় মাখামাখি হয়ে রয়েছে। কপিলা ঘাড় বাঁকায়। আঁটসাট করে পরা ডুরে শাড়ীটা হাঁটুর খানিকটা নীচু দিয়ে ধারালো এক ঝিলিকের মত ঝিকমিক করে তুঙ্গ বুকের যুগলকুম্ভ ডুরে শাড়ীর নীচে একটা বিভ্রমের মত স্তব্ধ হ'য়ে রয়েছে। চুলের মেঘে আর দেহের ভাঁজে ভাঁজে উন্মাদ তুফান তুলে কপিলা তুফানীদের বাড়ীর পথটা ধরল। খালের একটা বাঁক ঘুরে বয়রা বাঁশের সাঁকোর মাঝামাঝি এলেই তুফানীদের চৌচালাটা ঠাহরে আসে।

সাঁকোটার লাগোয়া একটা দেশী গাবের গাছ। আর তারই গোড়ায় নিবিড় স্বাস্থ্যে উদ্দাম হ'য়ে উঠেছে বনবেতসের ঝুপসি। থোকায় থোকায় ফলন্ত হয়ে রয়েছে বেতফল; জলবাঙলার স্নেহরসের আশীর্বাদ। কপিলা পাশের আটকিরে ঝোপটা থেকে একটা ডাল ভেঙে নেয়। তারপর থোকায় থোকায় নাড়া দেয়। ফল পড়ে ঝুপঝুপিয়ে। উবু হয়ে কুড়াতে থাকে তারপর। রসপুষ্ট ফল। কুড়াতে কুড়াতেই মুখে ফেলে টপাটপ। রসনায় যেন ফিন্‌কি ফোটে অম্ল স্বাদের। মধুর রসের। ফিকে সন্ধ্যা পাখ্‌না ছড়িয়েছে সবেমাত্র। অন্ধকারের হাল্কা বুনন কাশমোথরার ঝোপে আর জলজঙ্গলের আনাচে কানাচে। খালের ঢেউ থেকে বিকালী সোনার মায়া মুছে গিয়েছে। জল-ঘাসগুলোর দামে বর্ষার মাছের উল্লাস পাওয়া যায়।

"সুন্দরী ও সুন্দরী........."

চমকে ওঠে কপিলা। এই প্রথম রাত্তিরে নিশিতে ডাকে না তো! পেছন দিকে তাকায় ঘন ঘন। হ্যাঁ গাব গাছটার ও পাশটায় দাঁড়িয়েছে এসে ঠিকঠাক।

দেহটাকে বঙ্কিম করে রাখে কপিলা। জিভ শানিয়ে বলে— "তোর লাজশরম নাইরে বান্দা, যা-ষা এত যে খড়মপিটানি খাস।" এই যে তখন কইলি গন্ধ সাবান গায়ে মাইখা ভুরভুর বাস বাইর বাইর্যা আসবি। যা, যা। গায়ে যা গন্ধ!

"তোরে বড় মনে লাগছে কপিলা। কি করুম?" বোকা-বোকা দুটো চোখ তুলে ধরে নিতাই, বলতে থাকে—"নয়া বর্ষার মাছ মারতে বাইর হইছিলাম কোচখান লইয়া, দেখি তুই বেত ঝোপের তলে।"

ভুরু দুটো বাঁকাচোরা করে কপিলা জবাবে ধার দেয়—"অমন ভূতের মতন পিছনে আইসা খাড়ইছস্, নজরখান একেবারে ছিকায় তুলছস্,

ঐ যে ছিদামের কানা বইনটা আছে, একেবারে পেত্নীর মত সুরাৎ, তার পিছপিছ নাকানিচুবানি খা গিয়া।"

"এট্টু নরম কইরা কথা কইতে পারস না কপিলা, তোর কথা বুকে বাজে।"

নিতাইর গলায় জমাট কান্না থমথম করে।

"নরম কইরা কথা কমু কেমনে রে? খেজুর রসে কথাগুলি ভিজাইয়া? যা যা রসের কথা তোর লগে কমু ক্যানরে বেকুব। কত মানুষ আছে, কইলে তোর মনিব আইসা সেলাম দিবে তিন বার।" তারপর গলা নামিয়ে হাল্কা রেশের ঘূর্ণি তুলে বলে,—"মাজায় বড় দরদ, আমারে খালটা পার কইরা দে না তোর ডিঙিতে।"

"আয়!"

নিতাই কপিলাকে খালপার করে দেয়।

পারে নেমে কপিলা ফিকফিক হাসে। বলে—"যা, বান্দা, পিঠে তুলা বাইন্ধা যা, মনিব খড়ম লইয়া নাচতে আছে তোরে সোহাগ করনের লেইগা। তার থনে এক কাম কর, এই খালের জলে ডুইবা মর, আর পিটানি খাইতে হইব না।"

নিতাই বৈঠাটা দিয়ে খালের কিনারের মাটিতে খোঁচা দেয়। ধারালো স্রোতের খেয়াল খুশিতে নৌকা এগিয়ে চলে ছলছলিয়ে। দূরের বাঁক থেকে নিতাইর নেশাঘন গলাটা ভেসে আসে—

কোথায় পামু কলসী কন্যা, কোথায় পামু দড়ি
তুমি হও রে গহিন গাঙ্ আমি ডুইব্যা মরি।

খানিকটা স্তব্ধ হয়ে থাকে কপিলা, তারপর আবার খিলখিলিয়ে ওঠে। পাহাড়ী গাঙে বান ডাকার মত উদ্দাম হাসি—"আ লো নিতাই আমাগো আবার কবির গান গায়। গলা কি, যেন করাত দিয়া গাবগাছ চেরে।"

তারপর তুফানীদের উঠানে এসে ওঠে কপিলা।

ঘরের দাওয়ায় একটা হাল্‌কা আলোর টেমি জ্বলছে! আধনিভন্ত।
তিনকড়ি সারা দিনমানের পর ক্ষেতখামার থেকে ফিরে এসেছে সন্ধ্যার দিকে। তারপর আবার বেতবাঁধারি চৌরশ করতে বসেছে! ডালা কুলো হবে, হাটে গঞ্জে বেচতে পাঠাবে কারুকে দিয়ে। যা পাওয়া যায়— তাই মুনাফা। গায়েগতরে খাটে এরা অবিশ্রাম, উদয়াস্ত। নজর পড়ে নি তার কপিলার দিকে। সহসা পাকের ঘর থেকে ডালের একটা উগ্র সম্বরার গন্ধ ভেসে এল।
তিনকড়ি বেত তুলতে তুলতে বলে—"বউ কিসের সম্বরা দিছিস, এত ঝাঁঝ!"
তুফানী রান্নাঘরের মধ্য থেকে ছলছলিয়ে ওঠে, বলে— "মনের। ঝাঁঝ দেইখ্যা বোঝ না।
কপিলার বুকটা কেমন যেন উথলপাথল হ'তে থাকে। কেমন সোহাগ-আহ্লাদের ঘরগৃহস্থালি এদের। তারও তো এমনটি হতে পারে। রঙ্গ-রস ঘনিয়ে এনে কপিলা বলে— "হাইলা চাষার মাউগে (বউ) দেখি রসের কথা কয়। মনের সম্বরা দিছে—কি গো হাইলা চাষা, কথা কওনা দেখি!"
তিনকড়ি হাসি বুজিয়ে দেয় ঠোঁটের কানাচে। কথা বলে না, একেবারে চুপচাপ থাকে।
"কি গো বোবা হইয়া গেলা নাকী! শরমে রাঙা হইয়া গেছ তেলকুচের লাখান।"
কপিলা পাকের ঘরে এগিয়ে আসে। শুকনো পাতা দোআখার মধ্যে গুঁজে গুঁজে রান্নাবান্নার তদারকে ছিল তুফানী। পাশের দেউলকায়

কুপী জ্বলছে। তারই আলোতে দেখা যায় ওদিকের একটা নারকেলের মালায় খানিকটা তেঁতুল-মাখা।

কপিলা রাগের ভঙ্গি করে—"কাচা পোয়াতিতে তেতুলমাখা খায়!"

"এই এট্টু খাইছি, আর খামু না সই।"

"পোলাটারে মারবি তুই। কই ইন্দুরের বাচ্চাটা কই?"

"ঘুমাইছে।" তুফানী ঘনীভূত গলায় বলে—"একটা কথা, পরশু রাঙামিলায় রথের মেলা আছে, যাবি সই? কাচনাচ আর সঙ্ বাইর হয়। কবির গান হয়।"

টগবগিয়ে ওঠে কপিলা—"যামু।" তারপরেই নিভে যায়, বলে—"কিন্তু ভাইবৌটা কি মেজাজের জানস তো সই?"

"একটা দিন না হয় গুতা খাবি ভাইবৌর, আবার নিতাই আইসা ডইলা দিয়া যাইবথন।"

"আইচ্ছা।"

"নৌকা পামু কই? চলনদার কে যাইব?"

"ক্যান নিতাই!" কপিলা আলগোছে কথাগুলো ছেড়ে দেয়।

"হু, সে যাওনের লেইগা বইসা আছে। তুই যা স্যাকা দিয়া কথা কইস ভ্রূরেখা দুটিকে আঁকাবাঁকা করে তাকায় তুফানী।"

"যাইব লো যাইব, কইলেই যাইব, নৌকায় ক্যান, মাথায় লইয়া যাইতে রাজী।"

তুফানী ঘন হয়ে বসে কপিলার কানে মুখখানা গুঁজে বলে—"বুঝছি।"

"কি বুঝছিস।"

সুরের একটি লহর তুলে তুফানী গলাটা ছেড়ে দেয়—

মইরাছ মইরাছ হায় রূপের মোহেতে—
দিনে রাইতে কালার মুখ

খনে খনে তোরে সখী কইরাছে আকুল

মান লইয়াছ, কুল হইরাছ—

মাঝপথেই তাকে থামিয়ে দেয় কপিলা। বলে—"তোর মুখে আগুন, যাই আমি অখন। তা হইলে ঐ কথাই রইল। পরশু যামু রথের মেলায়।" ঋজু একটা নাচের ছলে উঠে দাঁড়ালো কপিলা।

"খাড় (দাঁড়া) তোর দাদারে লইয়া যা, রাইত হইছে।"

"তোর সোয়ামীরে লইয়া যাই যদি একেবারে।"

"পুরান পুরুষ। আমি তো এতদিন স্বোয়াদ লইলাম। তুই তারে নিলে "আবার একটা বানাইয়া লমু মাটি দিয়া, যা-যা। আন্ধার আইল ঘনাইয়া, নিতাই আবার চোঁক্ চোঁক্ করতে আছে মানকচুর জঙ্গলে।"

দুই

নিশিরাত্তিরে উঠে কাদামাটি ছানাছানি শুরু করে দিল কপিলা। চাকের ঘরের পৈঠেতে একটা কুপী জ্বলছে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে। বর্ষা-মেশানো হাওয়ার বেদিশা উল্লাস এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে শাড়ীর আঁচলে, বুকে পিঠে; কুপীর শিখায় কাঁপন লাগে থরথর। সকাল-সকাল মাটি চৌরশ করতে হবে, তারপর দুপুরের দিকে ছাঁচে ঢালাই করে বানানো হবে নানান জাতের পুতুল, রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মী, সরস্বতী এমনি অনেক নামের। অজস্র ঢঙের।

বাতাবী লেবুটার গাছে হাসিমুখ ফুল ধরেছে থোকায় থোকায়। একটা একটা লঘুস্বাদ আমেজী গন্ধ ভেসে এ'ল। দূরের জঙ্গল থেকে ত্রিযামা পথিক শিয়াল ডেকে উঠল কয়েকটা। সকালের সূচনা, আগামী দিনের ঘোষণা। কপিলা এঁটেল মাটির তালে পা চালায় ঘন ঘন।

নবীন পালের বাড়ী থেকে 'পইত্না'র শব্দ ভেসে এ'ল এক ঝাঁক। হাড়ি পাতিল তৈরীর তদ্বিরে সবাই ব্যস্ত হয়েছে। শেষ রাত্তিরের ঘুমকে নির্বাসন দিয়েছে সবাই; পেটের জন্য ধান্দা-ঝক্কি, নানান তাড়না। তাই বিছানার সোহাগ আর বন্দী করে রাখতে পারে নি। পেয়েছে অফুরন্ত এক ঘুম তাড়ানো কাজের নেশায়। 'পইতনা'র আওয়াজ আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে; পুব পশ্চিম আর উত্তরের বাড়ীগুলো থেকে।

কুমোর পাড়াটা বেশ জমজমাট। পাশাপাশি ঘরের চাল। ঘরেব

মত মনগুলোও খুব কাছাকাছি। এই 'পইতনা'র ঝাঁকের আওয়াজ আর কাদা ছানাছানির রোজনামচা দিয়ে মানুষগুলো একটা সমধর্মের সুতোয় বাঁধা। সমমর্মের তারে গাঁথা। আছে নানান শোরগোল, শরিকী বিসম্বাদ, তবু এ বাড়ীর পোয়াতি বৌ বিয়োবার সময় ও বাড়ীর জোয়ান ছেলে এসে চালা বেঁধে দিয়ে যায়। দক্ষিণের বাড়ীর যক্ষী বুড়ীর নাভিশ্বাস উঠলে উত্তরের বাড়ীর ঝিয়াড়ী এসে ডুকরে ডুকরে কাঁদে। সকলের সঙ্গে সমান অংশে শোক বাটোয়ারা করে নেয়। হাজারো কাজিয়া-বিবাদের গলদ ঝেড়েঝুড়ে রাখে একপাশে। নবজাতক আসছে—এ উৎসব তো মানুষের আদিম। মৃত্যুর ছায়া নামছে। এ শোক তো মানুষের আজন্মের। চিরকালের।

বিনোদ পালের বাড়ী থেকে 'পইত্না'র ঝাঁকের সঙ্গে একটা গলা উড়ে এ'ল বাতাসের পাখ্নায় চেপে। গাইছে বিনোদ পালের ভাগ্নে সুবল। গলাটা ছেড়ে দিয়েছে খোলাখুলি। ভারি মিঠা গলাখানা। কান দুখানা উঁচিয়ে রাখে কপিলা—

পুষ্করিণীর চাইর পারে ফুটল চাম্পা ফুল।
ছাইরা দে রে চ্যাংড়া বন্ধু ঝাইড়া বানতাম চুল॥
দুষমন পাড়ার লোকে দুষমনি করিবে।
এমন কালে দেখলে বন্ধু কলঙ্ক রটিবে॥
হস্ত ছাড় পরাণের বন্ধু চলিয়া যাইতাম ঘরে।
কি জানি কক্ষের কলসী ভাসাইয়া নেয় সোতে॥
দূরে বাজে মনের বাঁশী ঐ না কলা বনে।
তোমার সঙ্গে অইব দেখা রাত্রি নিশাকালে॥
রে বন্ধু, রাত্রি নিশাকালে।

ভারি তরিবৎ করে গাইছে সুবল। চনমন করে উঠল কপিলার

মনটা। এই কুপীর আলো-কুয়াশা, এই চাকের ঘরের ছোট্ট আয়তন, পুবপশ্চিমের ভিটাগুলো থেকে ভেসে-আসা 'পইতনা'র ছন্দিত সুরের সঙ্গে সুবলের স্বপ্নভরা মেলোয়েম গলার আড়াল-আবডাল দিয়ে উঁকি দেয় একখানা সোনামুখ। সত্যি নিতাই কখন কোন ফাঁকে যে তার ঝাড়াপোঁছা আলগোছ মনটার ওপর এক আশুর রঙের নেশা ছড়িয়ে দিয়েছে খেয়াল ছিল না। তার সহজ স্নিগ্ধ কোমল কুমারী মনের ভূমিতে কর্কশ পৌরুষের কর্ষণ শুরু হয়েছে অজান্তে।

পা দু'টো আচমকা থেমে গিয়েছিল কখন যেন। মনের সীমানায় ড্যাবা-ড্যাবা নির্বোধ একজোড়া চোখ-তুলে-তাকানো মানুষটা কখন যেন ঘনিয়ে এসেছে অনেকটা কাছাকাছি।

চমকে ওঠে কপিলা।

"তোরে এ কাম সাজে না সুন্দরী।"

নেশার আবিলতা এখনও মুছে যায় নি মনের আবেশ থেকে।

"এই নিশিরাইতে তুই নিতাই?" চকিত চোখে তাকালো কপিলা।

"চাই (মাছ ধরার যন্ত্র) পাততে আসছিলাম ভাতারমারীর খালে, দেখি—"

"থাউক থাম দেখি। দেখ গিয়া ছিদামের কানা বইনটা তোর লেইগা জাইগা জাইগা তেল পোড়াইল সোয়া সের। সেইখানে যা।"

সহসা কপিলা ধারালো হয়ে ওঠে। মুখেচোখে বিজুরী নাচে ঝিকিমিকি।

"কি করলে তোর মন পাই, ক' তো সুন্দরী; তোরে বড় মনে লাগছে। রাইতে ঘুমাইতে পারি না, নৌকা লইয়া খালে-বিলে ঘুইরা বেড়াই। খালি পরাণটা উথল পাথল করে। আর তোর মুখটা মনের মধ্যে ঘুরপাক খায়।" আকুল গলায় বলতে থাকে নিতাই।

"খালেই যা বান্দা, ছিদামের কানা বইনটার বরাত ভাল, একটা মাছ খাউকা পেত্নীর লগে মালা-বদল কর গিয়া।"—খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে কপিলা।

বুকের মধ্যে লালিত স্বপ্নটা এলোমেলো হয়ে যায় নিতাইর। কপিলার কথাগুলো যেন মাদার কাঁটার চাবুক। চেতনাটা কেটেকুটে রক্তাক্ত হয়ে গেছে নিতাইর।

"তোরে এ কাম সাজে না সুন্দরী, এই মাটির কাম!"

"কাম না করলে ভাত মিলব না, মিলব আখার আঙ্গার।"

সহসা নিতাই এগিয়ে এসে হাত দু'খানা ধরে কপিলার, বলে—"ল যাই কপিলা, আমার ঘরে চল, তোর কাম করতে হইব না, তোর এই কাম দেখলে আমার পরাণটা পোড়ায়।"

"পোড়ায় নাকি; ঘা হইচে কতখানি?" হাতদুটো ছাড়িয়ে কপিলা ভূরু বাঁকায়—"বান্দা তোর ঘরে গেলে কি পালঙ্কে বসাইয়া রাখবি না কি? আর আমার খেজমতের (সেবার) লেইগা বান্দা রাখবি কয় গণ্ডা?"

কপিলা হাসতে থাকে, আর নিতাইর মনটা ফালাফালা হয়ে যায়। খানিকটা দাঁড়িয়ে থেকে সে চাকের ঘরটা থেকে উঠানে এসে নামে। বলে—"যাই লো সুন্দরী।"

"যা, যা। তোর ঐ রূপ দেখলে চোখ জ্বলে।" গমকে হেসে ওঠে কপিলা। দমকে দমকে দু'লে ওঠে তার তরুণ তনু। নাচে তুঙ্গ বুক। কাঁপে সুঠাম গ্রীবা।

"আমারে দেখলে তোর চোখ জ্বলে!" বাতাবী লেবু গাছটার নীচে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ায় নিতাই। গলাটা কেমন যেন ছত্রখান শোনায়; "তবে আমি যাই তোর সুমুখ থিকা।"

হাসিটা এবার উদ্দাম হয়ে উঠলো কপিলার। সারা দেহ দিয়ে হাসছে সে। উন্মাদ প্রপাতের মত চোখে-বুকে সুডৌল অঙ্গে রঙ্গে রঙ্গে উছলে পড়ে সে হাসি। হাসির কলকলানি থামিয়ে কপিলা বললো; "আবার অভিমান আছে বান্দার। পেট ভরা গোসাও আছে। যাবি তো কইলি; যাবি কোন চুলায়? খালেবিলে আন্ধা রাইতে আমার কথা ভাবতে ভাবতে ভিরমি খাইয়া মরবি তো!"

"কী করুম আমি!" ড্যাবড্যাবা আর্ত চোখে তাকিয়ে থাকে নিতাই।

"তোর কিছু করতে লাগব না।"

"না লো কপিল, আমি যাই। এতক্ষণে 'চাই'এ মাছ পড়ছে।" এখনও নিতাইর কণ্ঠ কান্নায় থমথম করছে।

সহসা কপিলা বাইরের উঠানে নেমে এল। একটা তরল-মধুর গলায় সে বলতে থাকে—"বান্দার দেখি আবার রাগরঙ্গও আছে। অভিমানবুঝি!"

নিতাই এগিয়ে এল খানিকটা—একেবারে কপিলার নিঃশ্বাসের সামনা-সামনি। বলল—"আমারে কিছু ক'বি কপিলা?"

নিতাইর স্বরটা জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে আশঙ্কায়।

"কথা কইতে ঢোক গিলস দেখি সাতবার! আমি বাঘ না ভাল্লুক? সাধে কই তুই বান্দা!"

কপিলা ঝিকমিকিয়ে ওঠে।

নিতাই বোকাবোকা চোখদুটো এক পলক ছড়িয়ে দেয় কপিলার সারাটা দেহের তেপান্তরে। বলে—"তোরে বড় ডরাই কপিলা। তোর জিভে যা ধার!"

"তাই নাকি। মনটা বুঝি ফালাফালা হইয়া গেছে! আইচ্ছা যা পরশু আসিস গাবের আঠা দিয়া জোড়া লাগাইয়া দিমু কেমুন?"

খিক খিক করে হেসে ওঠে কপিলা তারপর আবারও বলতে থাকে—"আমার মাটিটুকু ছাইনা চৌরশ কইরা দিবি রে নিতাই। পুতুল বানাইতে হইব। তুই কাম কর, আমি একটু ঘুইরা আসি।"

নিতাই কথা বলে না। চুপচাপ। একেবারেই নিস্তরঙ্গ। ধীরে ধীরে এসে ওঠে চাকের ঘরটাতে; তারপর মাটি ছানতে শুরু করে দেয়। চৌকাঠের ওপিঠে ধোঁয়াটে আলোর কুপীটা খানিকটা রহস্যময় আলো ছড়িয়ে চলেছে। কুপীর এই আবছায়া আলোকে ভেঙেচুরে সুবলের গলাটা আবার এগিয়ে এল ঝলকে ঝলকে—

পুষ্করিণীর চাইর পারে ফুটল চাম্পা ফুল।
ছাইড়া দেরে চ্যাংড়া বন্ধু ঝাইড়া বান্ধি চুল ॥

পুষ্করিণীর চারপারেই শুধু 'চাম্পা ফুল' ফোটে নি, কপিলার মনেও ফুটেছে থরে থরে। অনেক, অজস্র। বুকের কোন একটা নিরালা নিভৃত থেকে সৌরভটা যেন ভেসে আসছে। এই শেষরাত্তির, সুবলের এই নেশাঘন গানের পদগুলো যেন ঘনীভূত রক্তের মধ্যে খানিকটা তুফান তুলে দিল। নিতাইকে ভারি সুন্দর মনে হচ্ছে—মাটি ছানা-ছানির মধ্যে বুকটা মনোরম ছন্দে ওঠানামা করে চলেছে আর সঙ্গে সঙ্গে এক একটা ঢেউ যেন ভেঙে পড়তে থাকে কপিলার ধমনীর উপকূলে। ড্যাবা-ড্যাবা চোখের নিতাই যেন আর বান্দা নয়; একেবারেই বাদশা হয়ে গেছে। কপিলার এই অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সে একছত্র নায়ক। জামরুল গাছের তলা থেকে কপিলা আবিষ্ট চোখে চেয়ে থাকে নিতাইর উত্তপ্ত পেশীগুলোর দিকে।

খানিকটা পর কপিলা চাকের ঘরটায় এসে উঠল।

এতক্ষণে নিতাই মাটি ছেনে চৌরশ করে ফেলেছে। ঘাম-জড়ানো মুখটা উঁচিয়ে সে বলে, "এই নে তোর মাটি। গেছিলি কই?"

"খালের কিনারে গাব গাছটার কাছে।"

"ক্যান ?"

„গাবের আঠা আনতে, আমার কথার খোচা লাইগা মনটা তো চৌফালা হইয়া গেছে তোর। তাই জোড়া লাগাইয়া দিমু।"

একটা রিম ঝিম হাসির ফুল্‌কি ফোটে কপিলার ঠোঁটের বাঁকা রেখায়। আর নিতাইর বুকটা কি এক বে-লাগাম অনুভূতিতে ঘুরপাক খায়, ওলটপালট হতে থাকে।

সহসা কপিলা একেবারে নিতাইর বুকের কাছাকাছি ঘনিয়ে এ'ল। তারপর বলল—"একটা কথা রাখবি নিতাই, পরশু রাঙামিলায়—তোর মনিবের গেরাম, সেইখানে রথের মেলা। লইয়া যাবি আমারে আর আমার সইরে একটু ?"

"যাবি তুই কপিলা ?" — উৎসাহিত হয়ে ওঠে নিতাই।

"যামু না তো, তোর লগে মস্করা করি নাকি !"

কপিলার গলায় একটা মধুর খুশির প্রশ্রয়।

"তুই একলা চল কপিলা, তুই আর আমি যামু।"

"উঁহু, সইও যাইব। কথা যে দিছি।"

"কথা দিছস যেমুন, ফিরাইয়া নে একটা ফিকির কইবা।"

নিতাই বলিষ্ঠ মুঠোয় কপিলার নিটোল নরম হাতখানা মোলায়েম ভাবে কচলাতে থাকে।

"না। সইরে নিতে হইব লগে। সিধা কথা।" কপিলার জবাবটা কেমন যেন সাফ সাফই।

এই মুহূর্তে নিতাইর মনে কথাটা দানা ধরেছিল — কয়েক গাছা বেলোয়াড়ী চুড়ির মধ্যে মনটা মাখিয়ে সে পরিয়ে দেবে কপিলার মোলায়েম মণিবন্ধে। কিনবে গন্ধ তেল, আতর, রঙীন ফিতে।

শৌখীন খেয়ালের জিনিসগুলির সঙ্গে প্রাণের খানিকটা সৌরভ, হৃদয়ের খানিকটা রঙ্গরস মিশিয়ে সে উপহার দেবে কপিলাকে। কিন্তু-কিন্তু—

নিতাই ভিজে গলায় বলতে থাকে—"কি করলে তোর মন পাই ক' দেখি কপিলা? তোরে যে মনে লাগছে জবর!" তোর মন পাওনের সোজা ফিকিরটা কইয়া দে।"

"থাম্, থাম্ বান্দা! মন আমার আসমানে, পিঠে পাখনা লাগা সোয়া দশ গণ্ডা, তারপরে উড়াল দিয়া যাইস মন পাইতে হইলে।"

কপিলা ফিকফিকিয়ে হেসে ওঠে।

আচমকা কুপীটা নিভে গেল আষাঢ়দিনের দমকা বাতাসে।

পশ্চিমের ভিটের চৌচালাটা থেকে দুটো চোখ এতক্ষণ জোনাকীর মত জ্বলছিল। কাপাসীর প্রখর ইন্দ্রিয়গুলো কেমন যেন একটা ধারালো গন্ধ পেয়েছে ক'দিন থেকে। কপিলার বিছানা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও কপাটের আবডালে এসে চোখ জোড়া শানিয়ে রেখেছিলো। কয়েকটা দিন ধরে সে নিতাইকে দেখছে পাকের ঘরের ওপাশে মানকচুর জঙ্গলটায় ছোঁক ছোঁক করতে। চোখ নয় কাপাসীর—যেন দুটো সন্ধানী আলো। রাত্রির অন্ধকারেও ঠিকঠাক টের পায় সন্দেহজনক কিছুর আভাস। কাছেপিঠে কোথায় কি ঘুরপাক খাচ্ছে তাও তার সতর্ক স্নায়ুগুলোতে ধরা পড়ে। কোন্ যৌবনবতীর ঘরে কোন বেআইনী জোয়ানটা টোকা দেয় রাতনিরালায়, কাপাসীর তেরিজে তার হিসাবটা আছে ঠিকমত। এতটুকু এদিক সেদিক হবার জো নেই।

চাকের ঘরের কুপীটা নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিছানার কাঁথাকানি-

গুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো কাপাসী। নিবারণকে ঝাঁকানি দেয় জোর হাতে। বলে—"ওঠ, ওঠ, শীগ্‌গির ওঠ।"
গলার স্বরে ব্যস্ততা প্রলয়ের মত ভেঙে পড়লো কাপাসীর। যেন এইমাত্র একটা দিগ্বিজয়ে বেরুতে হবে, এমনি উত্তেজনার রঙ কাপাসীর চোখেমুখে।
মাঝরাত অবধি পুইনে হাঁড়ি-পাতিল পুড়িয়ে এসে শুয়েছে নিবারণ। সারাটা দিনমান, তার ওপর রাত্রির আধাআধি জুড়ে গিয়াছে বেহিসাবী একটা পরিশ্রম। দুদণ্ড হাত পা ছড়িয়ে জিরোবার অবকাশ মেলে নি। গা-গতরেও যেন সাড়-সংজ্ঞা নেই একতিল। বিছানায় পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে নিবারণ।

একটা গন্ধকশলা জ্বালিয়ে কুপীটা ধরাল কাপাসী। তারপর আবারও এসে ঝাঁকানি দিতে থাকে নিবারণের হাতে। অবশেষে পাঁজরার সীমানাটা থেকে এক নখ মাংস খেসারত দিয়ে লাফিয়ে উঠে বসল নিবারণ। কাপাসীর নখে কি বিষ? কি জ্বালা! একরকম চীৎকার করেই উঠেছিল নিবারণ; কাপাসী কাপড়টা ঠেসে ধরল নিবারণের মুখে,—
"মরদ না তো, একেবারে মাগীরও বেহদ্দ। চুপ, চুপ।"
"কি ব্যাপার বউ?"
ঘুমমাখা রক্তজবার মত দুটো অনায় চোখ উঁচিয়ে ধরে নিবারণ।
"কুপী নিভাইয়া তোমার সোহাগের বইন যে নাগর আইন্যা পিরীত করে শেষ রাইতে, তার নিকাশ রাখ? খালি তো ঘুমাও বুইড়া মইষটার লাগান (মত)।"
কাপাসী জিভ নাচায় ঘন ঘন।

44৮৩
27.11.56.
Rs 2/8/-

"ক্যান তুই তো আছস।"—রক্তলাল চোখে নিবারণ বিছানার দিকে তাকায়, বার বার। ঘন ঘন।

"আমি আছি। তুমি মরদ না মাগী?"

"কি মনে হয়—ঘর তো করলি চৈদ্দটা বছর এক সাথে, কি মনে হয় লো মাগী।" হুঙ্কার দিয়ে উঠলো নিবারণ।

কাপাসী কথাটার জবাব দেয় না। নতুন কথার পাক খাওয়াতে থাকে মোচড় দিয়ে দিয়ে।

"বইনে কি করে দেখ গিয়া।"

"কি করে?"

নিবারণ প্রশ্নবোধক হয়ে ওঠে।

"শোনতে চাও। তবে ধানদূর্বা লইয়া বস কাপড় ছাইড়া। নাটাইচণ্ডীর বর্তের (ব্রত) মত পুণ্যির কথা। শোনলে পরকালের কাম হইব।"

কাপাসী খিকখিক করে হেসে ওঠে। তারপরে বলতে থাকে—"দেখ গিয়া চাকের ঘরে কুপী নিভাইয়া তোমার সোহাগের বইনে নাগরের বুকের মইধ্যে মিশ্যা গেছে। যাও দেইখ্যা আস যুগলমিলন।"

"চুপ মার; এই কাচা বয়সে তুই একটা পুরুষ আসেই! আমার বইনের দোষটা দেখলি কই?"

নিবারণ আবার বিছানা নেওয়ার তদ্বিরে যায়।

"দোষ কইছি আমি, একেবারে গুণের ডালাখান তোমার বইন।"

কাপাসী ফুঁসতে থাকে—"এর একটা বিহিত তা হইলে করবা না?"

নিবারণ ততক্ষণে আবার কাঁথার নীচে নিজেকে তরিবত করে নিয়েছে। বলে—"আলো আমার সতী বেউলা লো। বয়সকালে তোর নাগর আছিল কয় গণ্ডা? ক' দেখি?"

"কি? যা ভাবছস তাই ক'বি তুই!"

কাপাসী সহসা আগ্নেয় হয়ে ওঠে। জ্ঞানকাণ্ড কিছুই বোধ থাকে না। বলে – "তোগো বংশের লাথান আমাগো বংশ! সোয়ামী থুইয়া নাগর পোষে সধবা বউতে। এমন কথাও শুনতে হইল। মাগো এই পোড়া-কপাইল্যার লগে দিছিলা আমারে বিয়া!"

কাপাসী গলা বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে শুরু করে। রাঙা চেলি পরে সাতটা পাক ঘোরার পিছনে এতখানি দুর্বিপাকের ইতিহাস ছিল তা কি জানা ছিল আগেভাগে। কাপাসীর গলাটা আবার ঘনগর্জিত হয়ে ওঠে "তোর মত মরদের লগে যেদিন বিয়া হইছে সেই দিনই বিধবা হইছি।"

নিবারণ কাঁথার আবডাল থেকে কচ্ছপের গলার মত মাথাটা জাগিয়ে তোলে। বলে "আয় আয়। পায়ের আঙ্গুলটা দিয়া কপালের সিন্দুরটুকু মুইছা দেই আর শাখা দুইখান ভাইঙ্গা দেই গুতাইয়া। শেষে তুই বাপের বাড়ী যা গিয়া নাচতে নাচতে। নাগর জুটাইয়া লইস গণ্ডায় গণ্ডায়।"

আধাআধি রাত জেগে নিবারণের মেজাজটা ভয়াল হয়ে রয়েছে। কাপাসী ভরসা পায় না কথান্তরে যাওয়ার—খিস্তিও দিতে পারে না খুশি মাফিক, শুধু খেউড়ের রসটা পেটের নাড়ীতে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে থাকে। কেবলমাত্র টেনে টেনে গলার স্বরটা কাপাসী ছেড়ে দিল একবার—"পোড়াকপাইল্যা, ড্যাকরা…যমের অরুচি।"

তিন

প্রথম উজানী বয়স।

চনমনে রক্তে কিসের যেন একটা মাতামাতি। সারা দিনমান পদ্মা-মেঘনা উথল পাথল করে ডিঙি ছোটায় গোলক। হালের বৈঠা কঠিন মুঠোয় চেপে আকুল নেশার একখানা গান ধরে স্বপ্নভরা গলায়—

নদীর ঘাটে দেখা শুনা কাঙ্খেতে কলসী।
ঐছন করিয়া গেছে তোমার মোহন বাঁশী ॥
রে বন্ধু তোমার মোহন বাঁশী ॥
ঘরের বাহির হইতে নারি কুলমানের ভয়।
আর পিঞ্জরা ছাড়িয়া মন বাতাসে উড়য় ॥
রে বন্ধু বাতাসে উড়য় ॥

ভারি তরিবতের গলা গোলকের। খাল কি নদীর ঘাটে ছন্দিত বিকাল নামে অঝোরে; তেঁতুল কি অর্জুন গাছের চিরল চিরল পাতার ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে আসে বেলাশেষের তরল রোদের সোনা। ঝিলমিলিয়ে ওঠে জলজঙ্গল। আর এমনি সময় 'কাঙ্খেতে কলসী' নিয়ে তেঁতুল শাখার নীচে বেলাশেষের রঙেমধুরে মাখামাখি হয়ে এসে দাঁড়ায় কোন এক 'কেশবতী রাজকইন্যা।' ডুরে শাড়ী জড়ানো দীঘল দেহে আর আয়ত চোখের আয়তনে তার ঘনীভূত স্বপ্নের বিভ্রম। চোখের তারা দুটো তার নিথর। গোলকের ময়ূরপঙ্খী খালের ঢেউএর ওপর দিয়ে তিরতিরিয়ে এগিয়ে চলে; তার কাঁধের সীমানায় নেমে

আসা লম্বা লম্বা চুলের মেঘে আর টানা টানা চোখে কেশবতী রাজ-কন্যার নীল নয়ন ছড়িয়ে যায়। কি বিস্ময়! কি মধুর! তন্দ্রায়ত! কি মিঠে গলা গোলকের।

গোলক গান গায়; মাথা হেলিয়ে কানের কাছে হাত এনে। খালজলের প্রসন্ন আর লঘুদেহ ঢেউগুলোর ওপর দিয়েই শুধু তার মিঠে আর তন্দ্রাভরা আবিষ্ট সুরের নেশা ছড়িয়ে যায় না। ফুলপলাশী, রূপসাতলা কি জলমার কৃষ্ণলীলার সামিয়ানাভরা মানুষগুলো স্নিগ্ধ বিস্ময়ে গান শোনে গোলকের। গান নয় যেন মধুক্ষরণ। আর তাই দিয়ে গোলক মনের বেসাতি করে। খাতির তার সর্বত্র। খ্যাতির খাতির। অঞ্চল জোড়া নামডাক।...

সেই গোলক। একটা যাযাবর যৌবনের সম্রাট। কি একটা বেহিসাবী খেয়ালে রাঙামিলার মেলায় সেও দিয়েছে মনিহারী দোকান। আলতা, সস্তাদামের গন্ধতেল, চুলের ফিতে, ফিনফিনে বেলোয়াড়ী চুড়ি।

গানগমকের মানুষ গোলক। তার পছন্দসই জিনিস পত্তরে চিকন কাব্যবোধ। ভিনগেরামী মানুষ এসেছে অজস্র। কেরায়া কি 'গয়নার' নৌকায়। এসেছে রকমারী সম্ভার নিয়ে গঞ্জবন্দরের ব্যাপারী মহা-জনেরা। প্রচুর দোকান পসার।

তবু ভিড়টা বৃত্তের মত ভেঙে পড়েছিল গোলকের চারপাশে।

"ফিতা কত কইর‍্যা?"

"আলতাটা রক্তের লাখান রাঙ্গা হইব ত?"

প্রশ্নটা করল কপিলা।

এক পলক চোখের তারা দুটো কপিলার মুখে স্থির করে রাখে গোলক। তারপর ধীরে ধীরে বলে— "না সুন্দরী তোমার ঠোঁটের লাখান রাঙ্গা হইব।"

একটা মিহি হাসির লহর ছড়িয়ে গেল গোলকের পানরাঙানো ঠোঁটের আনাচে কানাচে।
মোটেই অপ্রতিভ হয় নি কপিলা। বলে—"বুঝলাম।"
"কি বুঝলা?"
"তুমি একটা বলদ।"
পাশ থেকে রিমঝিমানি হাসির লহর তোলে তুফানী। বলে—"না গো, একেবারেই গাধা।" গোলক একমুখ হেসে বলে—"হুঁ।"
কপিলা বলে—"আইচ্ছা ফিতা দাও দুই হাত—চুলের কাটা-আর গন্ধ তেলের শিশরি একটা, আর পাওডার আছে না?"
"আছে তো।" সহসা গলা নামিয়ে গোলক বলে ওঠে—"মাখাইয়া দিতে হইব না ত!"
"ক্যান তোমার ঘরে মানুষ নাই, তারে মাখাইও।"
"উঁহু, অখন তরি আসে নাই।"
"তবে মাখাইয়া দিতে পার, মজুরী কিন্তু দিতে পারুম না। একটা কানা আধলাও না।"
"পয়সা ত চাই না।"
"তবে কি চাও?"
"এক হাতা মন দিতে পার না?"
খিলখিলিয়ে ওঠে দুজনে। তুফানীও হাসে ঠোঁট টিপে টিপে ওদের রঙ্গ দেখে। কপিলাটা কি বেহায়া। লাজ-শরমের মাথা একেবারেই চিবিয়েছে পীরিত-সোহাগের দাঁত দিয়ে।
একটা ভুর করল কপিলা হরেকরকম খুঁটিনাটিতে।
গণ্ডগোল বাধলো কাঁচের চুড়ি পরাতে গিয়ে। অমন তুলতুলে তুলোর মত হাত। পট পট করে তবু ভেঙে গেল ডজনখানেক কাঁচের শিল্পবৃত্ত

মণিবন্ধে পৌঁছবার অনেক আগেই। গোলকের রোখ চেপে গিয়েছে। একটা ছোট লোকসানের খেসারত দিয়ে একটা বড় লাভ যদি মেলে মন্দ কি! কপিলাকে রাখা যায় যতক্ষণ!

কপিলা হাসে, বলে—"কি দোকানী, লাভের গুড় যে পিপড়ায় খায়—"

"কারে লাভ কয় জান?"

গোলক ধীরে ধীরে কপিলার তুলো-তুলতুলে হাতে একটা মিষ্টিরকমের চাপ দেয়।

"আগে জানতাম না, এখন বুঝলাম।"

গোলক চোখ তোলে। বলে—"তোমারে দেখছি যেন কোথায়? চিনি চিনি মনে হয়!"

"চিনি না একেবারে খাজুরা রসের গুড়, বাস বাইর হয় ভুর ভুর কইরা।—সাজনপুরের কপিলারে ভুইল্যা গেলা এরই মইধ্যে।"

"ও ও; তুমি নিবারণ পালের বইন তো। তোমারে ভুলতে পারি কন্যা, সেই সাজনপুরের বারুই বাড়ীর উঠানে গাইতে গেছিলাম—যাউক অনেকদিন পরে দেখা হইল, একটা বচ্ছর ঘুইরা গেছে।"

এই মুহূর্তে কপিলার মন থেকে নিতাই মুছে গিয়েছে, এই মেলা, তুফানী, সব কিছুর অনুভবকে ছাপিয়ে একটা মুখ মনের কেন্দ্রে আলো ছড়াতে থাকে। সে গোলক—গোলক কপিলার মনের গহনে আবেশ ঘনিয়ে আনে—মোলায়েম একটা তন্দ্রার মেঘকুয়াশা। এই মুহূর্তে এই মেঘ-কুয়াশার আবেশই সত্য—একান্ত ভাবেই সত্য।

কপিলা জড়ানো জড়ানো গলায় বলে—"হিজলতলীর খালে যাইও, বউন্যা গাছগুলির কিনার দিয়া ঘাটলা—বিকাল বেলা যাইও। আমি যামু খালের ঘাটে জল আনতে।"

"যামু।"

গোলক আবারও একটা নিবিড় চাপ দিল কপিলার কব্জিতে ॥

নানান শৌখিন জিনিস নিয়ে উঠে পরে কপিলা, তুফানীও সঙ্গ ধরেছে। ইতিমধ্যে নিতাই এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে। বলে—"রাইত ঘনাইয়া আইল, এইবার চল যাই গেরাম-মুখী, পাচ বাঁক জল ভাটাইয়া যাইতে হইব।"

"কে রে, বান্দা নাকি!"

কপিলা হাসিতে ঝিলিক তোলে।

"কপিলা তোর এটু ব্যথা-দরদ নাই লো।"

তুফানী রসের সম্বরা দেয়; মচকানো হাসির ফোড়ন দিয়ে।

নিতাই সাড়াশব্দ করে না। তার কথার পরমায়ু যেন শেষ হয়েছে। চুপচাপ তিনজনে নৌকায় এসে ওঠে। ইতিমধ্যে গোলক দোকান-পসার গুটিয়ে কোষনাওটায় এসে উঠল। বাণিজ্য তার শেষ হয়ে গিয়েছে। ময়ূরপঙ্খী ভরে সে মালপত্র তুলেছে—এ যাত্রা লাভই হ'ল। একটা থর-থরিয়ে কাঁপা বিহ্বল মনের ভরা নিয়ে চলেছে গোলক। কপিলা—কপিলা—একটা নামের সম্রাট সে এখন, পাকাপাকিভাবেই রাজ-রাজেশ্বর মনের মণিমুক্তার ঝাপিতে আজ সহসা দীপ্তি ফুটলো।

'পারা' তুলে নৌকাটা মাঝখালে নিয়ে এ'ল গোলক।

রথের মেলা থেকে শোরগোল ভেসে আসছে। মোচার খোলার মত নৌকাগুলোয় কেরোসিনের ডিবে জ্বালিয়েছে মাঝিমাল্লারা। ধীরে ধীরে বৈঠা চালাতে থাকে গোলক।

নিতাইর নৌকাটাও এগিয়ে চলেছে খানিকটা আগ দিয়ে; একেবারে পক্ষীরাজের মত—যেন জলের ওপর থেকে হাতখানেক ওপর দিয়ে ছুটেছে। বাদাম টাঙানো হয়েছে—খোলা খালের জোলো হাওয়া এসে লাগে জোর। শীতশীত করে সারা গা। এ-কথা সে কথা বলে তুফানী

আর কপিলা। হাসি তামাসার ঘূর্ণি ওঠে নিতাইর একমাল্লাই নাওটায়। নদীর পারে গ্রাম। জনমানুষের বসতি ঘন ঘন। টেমি জ্বলছে দাওয়ায়, ঘরে। এ-পড়া, সে-পাড়া থেকে ঢাক-কাঁসির বাদ্যি ভেসে আসে। কুলকুল করে উলু দেয় সীমন্তিনীরা। লক্ষ্মীশ্রী গ্রাম। একটা বাঁশঝোপ হেলে এসেছে খালের ওপর। তারই ফাঁক দিয়ে দেখা যায়—ভাঙা ভাঙা মেঘের সীমানা থেকে উঁকি দিয়েছে হাসিমুখ চাঁদটা। একপশলা স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না খালেব পল্‌কা ঢেউগুলোর ওপর দিয়ে তরঙ্গিত হতে থাকে। আচমকা কান দুটো উঁচিয়ে ধরে কপিলা। পিছনেব একটা নৌকা থেকে গলাটা ভেসে আসছে।

ও রঙ্গিলা নায়ের মাঝি
ওই ঘাটে লাগাইওরে নাও
নিগুণ কথা কইয়া যাওরে—
আমি পরাণ পাইত্যা শুনি।

এই গলা খুব ভাল করেই চেনে কপিলা। গোলক গাইছে গলা ছেড়ে। হ্যাঁ-হ্যাঁ হিজলতলীব খালে নাও ভিড়িয়ে 'রঙ্গিলা নায়ের মাঝি' নিশ্চয়ই 'নিগুণ কথা' বলে যাবে। আর কপিলা তা পবাণ পেতেই শুনবে না, পরাণ দিয়ে গাঁথবে।

গান শুনতে শুনতে একেবারে তন্ময় হয়ে গেছে কপিলা।

ইতিমধ্যে কখন যে গলাটা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে বাসাইলেব খালেব দূরবাঁকে মিলিয়ে গিয়েছে, এতক্ষণ খেয়াল ছিল না।

আচমকা সুজনগঞ্জের বাঁকে এসে একটা গোঁত খেয়ে নৌকার গলুই ঘুরে গেল। পাশের কেয়াঝোপে নৌকা ঢুকিয়ে নিতাই বলে—"কপিলা তোরা একটু বস। আমি একছড়া সুপারি লইয়া আসি। বড বড খাসা সুপারী।"

এমন আয়তন দেখালে সুপারির—মুঠোয় কায়ক্লেশে ধরে আর কি!
কপিলার গলাটা আশঙ্কিত, "বলে—চুরি কইর‍্যা আনবি?"
"না, গাছ থিকা পাইড়্যা আনুম।"
ব'লে এক অনুপল দাঁড়ালে না নিতাই, হাঁটু অবধি কাপড় গুটিয়ে জলটুকু পেরিয়ে গেল হন হন করে তারপর।
সাদা সাদা দীঘল সুপারি গাছের বাগিচা—সুপারি পেকে কাঁচা সোনার রঙ ধরেছে। এদিক সেদিক একবার নিরীখ করে গাছ বাইতে শুরু করে দিলে নিতাই।
দু'চার ছড়া পেড়ে-আধা গাছ নেমেছে নিতাই—অমনি জন পাঁচসাতেক বেরিয়ে এ'ল পাশের আটকিরে জঙ্গলের আবডাল থেকে। ঘাপটি মেরে বসে ছিল তারা সন্ধ্যেবাত্তির থেকে। হাতে সুপারি গাছের বাখারি দিয়ে বানানো সড়কি আর বয়রা বাঁশের লাঠি। দশদিন চোরের, একদিন গৃহস্থের, সব লোকসান সুদেআসলে তোলার লগ্ন।
কে জানত এমন কুগ্রহ পিছনে? মহা আহাম্মুকি হয়ে গেছে। আপাতত সেরে যাবার কোন ফাঁকফোকর নেই। ইতিমধ্যে হাঁকডাক শুরু করে দিয়েছে ওদের জনকয়।
"সকাল সকাল আয় মালাচন্দন লইয়া। জামাই অভিমান কইরা গাছে উঠছে। আর ছাড়নছোড়ন নাই। গরুর দড়িও আনিস একটা। একেবারে বাইন্ধা লমু আইজ।"
"মাইয়া বলে চুক্ষু আন্ধার কইরা ফেলাইল কাইন্দা কাইন্দা।"
এমন বিপাকে জীবনে পড়ে নি নিতাই। ওপর থেকেই রকম-সকম দেখছে। ভাবগতিক বিশেষ সুবিধের নয়।
"আস, নাইম্যা আস। দেরি করলে মাইয়া বাচান যাইব না কইয়া খুইলাম জামাই।"

"শেষে, আমাগো অপরাধের ভাগী করতে পারবা না কিন্তু..."

দাঁতে দাঁত রেখে নিতাই বলে—"সুমুন্দির পুতেরা রাঙামিলার হাটে পাইলে হয় একফির।"

"জামাই দেখি আবার বীজমন্তর পড়ে। অভিমান হইছে বুঝি, তা তো বুঝি। বুঝমান মানুষ হইয়া অবুঝ হইলে কাম হয়। আস, আস। নাইম্যা আস।"

কেউ গাছে উঠে জামাইর হাত ধরে সাধাসাধি করতে ভরসা পায় না। নীচ থেকেই শালাদের রঙ্গরসিকতা চলে। নিতাই ইতিকর্তব্য ভাবছিল। আচমকা গাছের গোড়ায় কুড়ালের কোপ পড়তেই চমকে ওঠে। খাসা বুদ্ধি বাতলেছে শালারা। মনে মনে তারিফ করে নিতাই। এমনটি না হ'লে আর শালা-সম্বন্ধী! কি বাহারের রসিকতা।

লাগালাগি সুপারি গাছ। নাগাল পাওয়া যায় হাতের আওতায়। নীচে কোপের পর কোপ চালাচ্ছে শালারা আর তারই মধ্যে চাপাচাপি করে হাসি থামাচ্ছে। আচমকা পাশের সুপারি গাছে এসে মরিয়া হয়ে ঝাঁপ দিল খালে। হাত দশ বারো তফাতে বউমারির খাল। সেখান থেকে এক ডুব সাঁতারে কেয়াঝোপের মধ্যে। পানকৌড়ির মত ভুস্ করে ভেসে উঠল নিতাই। কপিলা আর তুফানী চুপচাপ বসে ছিল—চম্‌কে ওঠে।—"মা গো।"

"ডর নাই, আমি নিতাই।"

নিতাই নৌকায় উঠে বৈঠার পাড় দিয়েছে জলে—ইতিমধ্যে একজন এসে চেপে ধরল নৌকার গলুই।

"আস, আস ভগ্নিপতির বাড়ী যাইবা বউয়ার ভাই—" বলেই কাঁঠাল-কাঠের বৈঠাটা উঁচিয়ে নিজের শক্তিআন্দাজ এক বাড়ি বসিয়ে দিল

নিতাই, লোকটার মাথা বরাবর। ভিরমি খেয়ে পড়ে গেল লোকটা —কেয়াঝোপ ঘুলিয়ে ওঠে জলে কাদায় আর রক্তে মাথামাখি হয়ে।

অনেকটা দূর অবধি নৌকাটা যেন উড়াল দিয়ে এ'ল।

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসেছিল তুফানী আর কপিলা। কথা কইতেও ভুলে গিয়েছে—শুধু বুকটা ধুকধুক করে বাজছে।

বাওয়া বন্ধ করল নিতাই। তারপর জল থেকে বৈঠাটা আলগোছে তুলে আনলো।

কপিলা বলে—"ব্যাপার কি রে নিতাই?"

হা-হা করে একটা ঝোড়ো হাসি হাসতে থাকে নিতাই। বলে—"জষ্ঠি মাসে জামাই ষষ্ঠী ত। আইতে কইল নয়া কাপড় নিতে। মাইয়া বলে চোখ আন্ধার করতে আছে কাইন্দা কাইন্দা।"

অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে কপিলা— "সে তো আগামী বচ্ছরে।"

"হয়, হয়; আগের থিকা বায়না দিয়া রাখলো।"

মনটা এখন ভারি প্রসন্ন। কানের কাছে হাত এনে সখীসোনার গান ধরতে ইচ্ছা করে নিতাইর। এতক্ষণে চাঁদটা পূর্ণায়ত হয়ে দেখা দিয়েছে আকাশে। জ্যোৎস্নায় ঝিলমিল করে নদীর জল। চাঁদের আলোয় দিনমান হয়ে উঠেছে যেন আঁধার রাত্রিটা।

খালের ঘাটে এসে তুফানীকে পার করে দিল প্রথমে। তারপর নাও এপারে নিয়ে এসে নিতাই ভিড়াল গাবগাছটার নীচে। কপিলা আল্‌তা-চুড়ির ভুরটা নিয়ে নামল পারের মাটিতে।

নিতাইও সঙ্গে সঙ্গে নামল। খানিকটা আমতা-আমতা করে বলে—

"একটা কথা কপিলা, মেলার থিকা কাঁচের চুড়ি আনছি—তোরে পরাইয়া দিমু—হাত দে—"

নিতাই চুড়িগুলো বের করে হাতের মুঠো মেলে।

কপিলা খানিকটা পিছিয়ে যেতে যেতে বলে—"রাইত তো হইছে। খালের বাঁকে যা, তোর লেইগা কাইন্দা কাইন্দা মাছখাউকা পেত্নীতে তো চোখ আন্ধার কইরা ফেলাইল—যা, যা তার হাতে পরাইয়া দে গিয়া।"—তার হাসি ঝিলকিয়ে ওঠে জ্যোৎস্না চিরে চিরে।

চার

মধুটুকুরি আমগাছটার নীচে দাঁড়িয়ে নজরটা চালিয়ে দাও আদিগন্তে। খেয়ালখুশিমত। শুধু ধানের চারা। কালো মেঘরঙা ধানবন। এ যেন আর এক মেঘনা—এক আকাশ মেঘ যেন ঘনীভূত হয়ে রয়েছে চক্ররেখা অবধি টেনেদেওয়া মাঠেচকে। ধান গাছে গান গায়—শুনেছো এমন কথা। কান পাতো। গমকের কলি উঠছে হাওয়ার সোহাগে। আষাঢ়-শ্রাবণের এই মেঘঘন ধানচারা অঘ্রাণ পৌষে স্বর্ণশীর্ষ হয়ে উঠবে চাষীকৃষাণের পরিশ্রমের পরশপাথর লেগে।

ধানের ক্ষেত সিঁথির মত চিরে চিরে কোষনাওটা এগিয়ে চলেছে ময়নামতীর খালের দিকে। বায়েবালি বৈঠা চালাতে থাকে ধীরে ধীরে।

আলপথের ওপর জল উঠছে কোমরখানেক।

নিতাই পছন্দসই জায়গায় নেমে নেমে 'চাই' পাততে থাকে। নিশি-রাত্তিরে এসে তুলবে 'চাই'এর মাছ। প্রথম বর্ষার মাছ—নানান জাতের, নানান কিসিমের। বোয়াল, চিতল, কালভাউস···

সন্ধ্যে রাত্তিরে নিতাই একটা 'ধর্মজাল' জোগাড় করে এনেছে কোথা থেকে যেন। চাঁদের আলোয় জল চকচক করে, মাছের আলাপ পাওয়া যায় একেবারে জলের সমতলে।

আগে থেকেই ফন্দিফিকির এঁটেছে একা একা। বায়েবালিকে নিয়ে রাতভর 'ধর্মজাল' বাইবে। নিতাই বলে "খালের মুখে বাও ভাই নাওখান।"

"ক্যান্ ?"

"জাল বামু ; লক্ষ্মণের জালখান কর্জ লইয়া আসছি একটা রাইতের লেইগা।"

"আইজ থাউক না।"

"শরীর-গতর কেমুন আছে। অসুখবিসুখ না তো।"

নিতাইর গলায় একরাশ উদ্বেগ।

"না, না। জোরবল আছে ঠিকই নিতাই ভাই। কিন্তুক মন যে আকুলিবিকুলি করে—"

"কেমুন, কেমুন ?"

নিতাইর কথা বলার ধরনধারনে কৌতূহলের উত্তেজনা।

রায়েবালি কথার টানাবোনা করতে থাকে—"আকুলিবিকুলি না, মনেরে টানে যেন কাছি বাইন্ধা।"

"কে ? মানুষটা কে ?"

"মাছখাউকা পেত্নীতে।"

বলে একটা উন্মত্ত হাসিতে ভরে তোলে সারাটা দেহ।

ছ্যাঁৎ করে ওঠে নিতাইর মনটা। অমন কথা কপিলাও বলেছিল সেদিন। বুকটা বুঝি চৌফালা হয়ে যাবে ঐ একটা কথার পোঁচ লেগে লেগে।

ইতিমধ্যে নাওটা খালের জলে এসে নেমেছে।

রায়েবালি বলে—"কি গো, একেবারে বোবা হইয়া গেলা নাকি ?"

"উঁ।" চমকে ওঠে নিতাই, বলে—"কিছু কইলা রায়েব ভাই ?"

"আমি না তো, নিবরণ পালের ছোট বইনটা আসমান থিকা কথাগুলান ফিক্যা দিছে।"

খিল খিল করে হেসে ওঠে রায়েবালি।

"ধাও, তোমার সবটাতেই ঐ এক মস্করা।"

নিতাইর চিতানো বুকটা যেন মিইয়ে যায়, লাজশরমের ছোঁয়াচে।

সহসা গলাটা এক পর্দা নামিয়ে আনল রায়েবালি। বলে—"নিতাই ভাই, একটা খুবসুরত কইন্যা আছে একেবারে হুরীর লাখান?"

নিতাই চুপচাপ থাকে। রায়েবালি উৎসাহিত হয়ে উঠল—"চোখে দেখলে একেবারেই ভিরমি খাইবা। লও যাই এট্টু ফুর্তি কইরা আসি।"

নিস্তেজ-নির্জীব গলায় নিতাই বলে—"কোথায়?"

"সালেনারে চিন? সিকিমালির মাইয়া। খালের একটা বাঁক ভাটাইয়া গেলে ঐ যে টিনের চৌচালা ঘরখান—সেই বাড়ী।"

রায়েবালি তেজী টান দেয় বৈঠার ফলায়।

নিতাই বলে—"আমার বড় ডর করে ভাই।"

হো-হো করে একটা অনার্য হাসি হেসে ওঠে রায়েবালি। বলে—"মরদের সামনে এমুন কথা আর কইও না। শাড়ী পরাইয়া পাকের ঘরে পাঠাইয়া দিব।"

হাসিটা দমকের সুতোয় পাকিয়ে পাকিয়ে উন্মত্ত করে তুলতে থাকে সে। এই দশাসই জোয়ান নিতাই। চিতানো একটা অনার্য ছাতি—জোরে-জবরে বুনো বাঘের মতই বেপরোয়া। এখন কেমন যেন মিইয়ে গেছে। শিরাউপশিরার মধ্য দিয়ে একটা হিমেল অনুভূতি বয়ে চলেছে থরথরিয়ে। উদ্বিগ্ন গলায় বলে—"না ভাই, সত্যসত্যই আমার ডর করে।"

"ডরের কি আছে মিতা, জোয়ান মরদের এ ছাড়া আর কি আছে। ভারি খুবসুরত মাইয়া—একেবারে হুরীর লাখান। একদিন চল, ডর ভাঙলে দেখবা ঘরে মন টিকব না; ছোক ছোক কইরা আপনেই গিয়া উঠবা 'কইন্যা'র পিরীতের টানে। এই তো দুনিয়া।"

রায়েবালি এসে হাতদুটো চেপে ধরে নিতাইর। বলে—"লও যাই, কেমুন!"

পিরহানটার তলা দিয়ে একটা বলিষ্ঠ বুকের উদ্ধত ঘোষণা। শালতক্তার কপাটের মত পাকাপোক্ত। তবু ধুকধুক করে বুক। হাত-পা'র খিলানগুলো যেন ঢিলে-আলগা হয়ে গেছে। বলে কি রায়েবালি! না-না এ অসম্ভব। এই রূপাগলা জ্যোৎস্নার রাত, এই জলজঙ্গলের স্বপ্নকুয়াশা, আকাশের খেয়ালী সীমানায় তারার আলোর দেয়ালী, সব কিছুর ওপর কে যেন এক আস্তর কালির পোঁছ লাগিয়ে দিয়েছে। একটা বিষাদ-বিষাক্ত মনের পাশাপাশি বসে থাকে নিতাই।

রায়েবালির অফুরন্ত কসরৎ। নানান পাকে, নানান মোচড়ে, নানান কথার ফন্দিফিকিরে সে একটা তন্দ্রায়িত স্বপ্নের আবেশ টেনে নিয়ে আসে। রূপকন্যার গায়ের সুবাস, তার চোখের ঠমক, বুকের গমক, চলাবলার ঠসক সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে নিতাইর মনের পাতে একঝলক মোহকামনার মিনা এঁকে দেয়। ভারি সতর্ক মাঝি রায়েবালি। গুণ টেনে, পাল টাঙিয়ে নিতাইর মনকে স্বপ্নঘন একটা আচ্ছন্নতার মোহানায় টেনে নিয়ে চলেছে।

রায়েবালি বলে—"এখনও ডর, তবে আমারে খালপার নামাইয়া তুমি যাও গিয়া যেখানে খুশি।"

ডর! মনের মধ্যে একবার ঘৃণিত হয়ে উঠল কথাটা। পৌরুষের কোন একটা ভারসমতার বিন্দুতে খোঁচা লেগেছে জবর। দিনরাত গাঙের সঙ্গে হুটেপুটি, খালের পারে দাঁড়িয়ে 'ক্ষেপ্‌লা' জাল ছুঁড়ে দেয় পনের হাত ফারাকে, এক উয়াসে নৌকা ভাটিয়ে নেয় সাত ক্রোশ; জলঝড়ের উন্মত্ত রাত্তিরে রশি দাঁতে চেপে ডুবো ডিঙি টেনে তোলে মেঘনার পাড়ে। সে মানুষের ডর! নীরেট ছাতির ভিতরে ঘুণ ধরেছে

কি কোথায়ও ? এত বড় হৃৎপিণ্ডটা কি ভয়ের লোনা জলের দাঁত কুরে কুরে খেয়েছে ?

না—না !

নিতাই তেজী গলায় বলে—"ডর ঠিক করে না, তবে মানুষে কইব কি ?"

"মানুষে কইব ছাই। জোয়ান পুরুষ যুবতী কইন্যার কাছে যাইবই, মানুষের কথায় কি আইল, গেল।"

রায়েবালি মুখিয়ে ওঠে।

"না—ভাই ; কেমুন যেন লাগে, বুকটা কাপে···"

নিতাইর গলার জোরটা আবার ঢিলেঢালা হয়ে যায়।

"জোয়ান মরদ, মাইয়ালোকের খুয়ার ছাড়া ঘুমাও কেম্নে ? আমার তো ঘুম আসে না।"

রায়েবালি উস্কানি দেয়। নিতাইর রক্তের অণুপরমাণুগুলো ভেঙে পড়ে ছলাৎছলের উন্মত্ত তরঙ্গে। তারও দু'টি উদ্দাম বাহুবেষ্টনের মধ্যে একদা বউ ছিল বৈ কি ! সরলাকে ভোলা কি যায় ? সে তো মিশে আছে তার তরঙ্গঘন বুকের পেষণে। সরলার সঙ্গে সেই মধুর অতীতে এক একটা কি ক্ষ্যাপা দিনই না গিয়েছে ! অথচ—অথচ—একএকটা তন্দ্রায়িত দিন এসে উঁকি দিয়ে যায় আচম্কা আচম্কা। রায়েবালি বলে—"তুমি একটু নায়ে বস, আমি খবর দেই সালিনারে।"

সিকিমালির বাড়ীর লাগোয়া একটা বয়রা বাঁশের সাঁকো। ডিঙিটা সাঁকোর বাঁশে বেঁধে রায়েবালি উঠে পড়ল।

নিতাইর মনের পাতায় সরলা ভেসে উঠল ; সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের পর কয়েকটা মাতলামি-ভরা দিন। মেঘনার ওপারের মানুষ নিতাই।...

সে কি অনেকদিন ? বাপমার সঙ্গে সম্পর্ক চুকেবুকে গিয়েছে, নিতান্তই ছেলেবয়সী তখন নিতাই ; বুঝবুদ্ধির কলি ফোটে নি। আজকাল

বাপমার কথা মনেও পড়ে না; তাদের স্মৃতির আদলও নেই মনের আনাচে কানাচে, অনুভব নেই সহজ স্নেহের।

দূর সম্পর্কের এক মামা পালতো।...

কোনাখোলা গ্রামটা মাইল পাঁচেক ফারাকে। সুজন সাধুর বাড়ী সেখানে; তার মেয়েটা বেশ ডাগর ডোগর, স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধ। নাম সরলা। সরলা...তার যাযাবর জীবনের প্রথম স্থিতি-গৃহস্থির ভরসা। ভাগ্নের সঙ্গে জোড় মিলিয়ে দিয়েছিল হরিপদ। হরিপদ নিতাইর মামা।

মনের মত বউ। ঝুমঝুম করে মল বাজিয়ে হেঁশেলে হাঁড়ি নাড়ত, মেটে কলস কাঁখে নিয়ে যেত নদীর ঘাটে। নিতাই ক'দিন আজিরা-আল-গোছ হয়ে বসেছিল ঘরে, বউএর কাছাকাছি। কথার কামাই নেই—গাঙের কথা, ঝড়তুফানের গল্প। জীবনের গল্পকথার ঝাঁপিটা খুলে গিয়েছিল সহসাই। মলের ঝুমঝুমি আব সরলার চলনচালন ভুলিয়ে রেখেছিল কয়েকটা দিন। মেঘনার তুফান যেন আটকা পড়েছে ছোট্ট চৌচালা ঘরখানায় কোন এক যাদুতে। যৌবন নয়ত যেন ছাপাছাপি মেঘনাব জোয়ার আর সেই জোয়ারে সরলা যেন বান-ডাকার উথলপাথল।

নিতাই সরলাকে বুকের মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে বলত—"বউ আর এট্টু বুকের কাছে আয়।"

"আমি যে বুকের মধ্যেই।"

"মনের মধ্যে আয় বউ।"

উন্মত্ত বুকের পেষণে সরলা যেন গলে গলে মাখামাখি হয়ে যেত নিতাইব সারাটা দেহে।

কিন্তু আজ সে সুর মুছে গিয়েছে।...

সরলার স্নিগ্ধ মুখখানার নেপথ্যেও বিষ ছিল। টের পেল কয়েকটা দিন পরে। তবে বিয়ের পর এই যে পীরিত-সোহাগ সবই কি সরলার মুখের!

নিতাই মাঝির লগি সরলার মনের মেঘনায় থই পায় না—অনেক গভীর সে মেঘনা, অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। সেই খালের যে মাঝি, অবশেষে তার সাক্ষাৎ মিলল। সরলার বাপের বাড়ীর দেশের মানুষ। নাম কার্তিক। চেনে বৈ কি নিতাই তাকে! কঙ্কাবতীর খালে ভেসাল জাল পাতে বর্ষার মরসুমে, ইলিস মাছের খন্দে ডিঙি জাল নিয়ে যেত পদ্মা-মেঘনার তেপান্তরে। নিতাইও কেরায়া বাইতে যেত এদিক-সেদিক। ওর সঙ্গে তামাকের কুটুম্বিতা অনেক দিনের। এর তামাক ওর কল্কিতে চেপে অনেক বারই পুড়েছে।

কয়েকটা দিন তাকে তাকে রইল নিতাই; কার্তিক তার পাকের ঘর, জুতের ঘরের আনাচ কানাচ দিয়ে ঘুরপাক খায় নিত্য।...

মাঝরাত্তিরে বউকে কাছে টেনে নিতাই জিজ্ঞাসা করেছিল—"কার্তিক আসে ক্যান্?"

"তারেই জিগাইও।"

"তুই কিছুই জানস না?"

"তোমার কি মনে হয়?" সরলার জবাবটা কি স্পষ্টায়ত।

"তুই ওরে ভালবাসস। তবে আমার বুকে ছোবল মারলি ক্যান্ কাল-নাগিনী? কার্তিক যেন আর না আসে!"

জবাবটা সঙ্গে সঙ্গেই দেয় নি সরলা।...দিয়েছিল লক্ষ্মীপূজার রাত্তিরে। কয়েকটা দিন পরেই ছিল লক্ষ্মীপূজা, সে রাত্তিরে নিতাই গিয়েছিল আমতলীর হাটে। যাত্রাগান হবে—লক্ষ্মণের শক্তিশেল পালা। অমূল্য ভূঁইমালীর দল বায়না নিয়েছে—খাসা গায়।

পালা শেষ হ'ল শেষ রাত্তিরে। বাড়ী ফিরতে ফিরতে আকাশের মুখ থেকে পোহাতি তারা মিলিয়ে গিয়েছে। হাঁক দেয় ঘাটলায় নৌকা ভিড়িয়ে—"বৌ কুপীটা ধরাইয়া আন।"

কুপী জ্বালিয়ে আনবার যে, সে ততক্ষণ কেরায়া নৌকায়—তালতলার বাজার ছাড়িয়ে মেঘনার সীমানায় গিয়ে পড়েছে। সঙ্গে সেই কার্তিক—সরলার প্রথম বয়সের প্রথম উষ্ণতা। আপাতত নৌকা চলল নোয়াখালি। ও নৌকার মুখ আর কোনদিনই ঘুরবে না।

খোলা কপাটটা হা-হা করছে। ঘরের খুঁটিগুলো পোক্ত বাঁশের, গায়ে ফুকর করে কুড়ি তিনেক টাকার রেজকি রেখেছিল নিতাই। গিয়ে দেখে দুখণ্ড হয়ে পড়ে আছে পশ্চিমের ধারের বাঁশখুঁটি।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল পালা শুনে এসেছে সারা রাত। সত্যিসত্যিই এই পোহাতি রাত্তিরে একটা বিষম শক্তিশেল এসে লাগল তার পাঁজর বরাবর। বড় ভালবাসত সে সরলাকে। তার মনের মেঘনায় নিতাই মাঝির লগি থই পায় নি কিন্তু কার্তিক নির্বিবাদে ময়ূরপঙ্খী নিয়ে পাড়ি দিয়েছে। একটা ঘনীভূত দীর্ঘশ্বাস পাঁজর বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এল।

সরলা কথা রেখেছিল—তারপর থেকে কার্তিক আর আসে নি ওদের গ্রামে

রায়েবালি গিয়ে ছিটে বেড়ার পিঠে টোকা দেয়। ডাকে ফিসফিসিয়ে—

"সালিনা ও সালিনা।"

"কে ? রায়েবালি ?" ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সালিনা।

"হ, মানুষ আসছে।"

"কই ? লগেই নাকি ?"

"না। খালের ঘাটে নায়ে বইসা রইছে।"

রায়েবালি টেনে টেনে কথাগুলো ছাড়তে থাকে।

সালিনা বেরিয়ে এ'ল বাইরে। বাঁশের ঝাঁপটা বার দুই ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে থেমে গেল।

রায়েবালি বলে—“একেবারে অনেকোরা নয়া, শিখাইয়া-পড়াইয়া নিতে হইব।”

“আমার গায়ের গন্ধ পাইলেই ঠিক হইয়া যাইব।”

সালিনা খিক খিক করে হেসে ওঠে।

রায়েবালি বলে— “ভাগ-বখরার কথা মনে আছে তো! আধা আধি।”

“আছে রে পেতি শেখের ছাও, আছে।” সালিনা কোমরের সঙ্গে চোখ নাচায় অন্ধকারেই।

“আমি মানুষ জুটাইয়া আন্নুম—” সহসা কথাটার হাল ঘুরিয়ে বলে—“দেখ একেবারেই নয়া, আইজ মাগনায় রসের স্বোয়াদ পাইতে দে···”

সালিনা শুধু আলগোছে বলে—“আইচ্ছা। কিন্তু ক এর পর থিকা টাকা চাই, জানস তো সংসারের হালচাল, বাজানের বর্গাজমি ছুটাইয়া নিছে ভূইয়া।”

“এমনেই দিব। চাইতেই হইব না।”

চমকে ওঠে নিতাই।

এক আকাশ শ্রাবণমেঘে ঢেকে গিয়েছে চাঁদের মুখটা। থমথমে অন্ধকার জমজমাট হয়েছে ঝোপে জঙ্গলে, জলে-কাদায়। এতক্ষণ ঠাহরে আসে নি কখন রায়েবালি আর সালিনা এসে দাঁড়িয়েছে।

সালিনা বলে—“এই অন্ধকারে বইসা বইসা মশার কামড় খাও, আর ঐদিকে আমার পরাণ পোড়ে তোশকের শয্যায় শুইয়া শুইয়া।”

“আমি, না—না—” ভ্যাবাচ্যাকা মেরে যায় নিতাই, থতমত খায়, বিষম লাগে কথা কইতে।

“তোমার লেইগা সন্ধ্যারাত্তির থিকা বইসা রইছি একা একা। আস।”

ইতিমধ্যে রায়েবালি নৌকার গলুই চেপে ধরেছে। সালিনা নেমে এসে হাত দুটো চেপে ধরে নিতাইর।

এতক্ষণ ফেলে-আসা বিরহ-বিক্ষুব্ধ জীবনের ছায়ামায়ার একটা ছবি মনের কোন একটা অঞ্চল থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে আসছিল। বর্ষাসজল মাটির স্নেহরস চুষে বেনেবউ আর কাঞ্চন ফুলগুলো বেশ সুপুষ্ট হয়ে উঠেছে। একটা আচ্ছন্ন-করা মদির সৌরভ ভেসে চলেছে জলজঙ্গলের সামিয়ানার নীচে। এই বুনো ফুলের উদ্দাম সৌরভ আর একটা উন্মত্ত অতীতের স্মৃতি আচমকা ফালা ফালা হয়ে ছিঁড়ে গেল সালিনার ধারালো কথার বর্শা লেগে লেগে।

হাত দুটো তেমনিই ধরা রয়েছে। নিতাইর উপশিরার ভিতর দিয়ে ঝলকে ঝলকে আগ্নেয় বিদ্যুৎ যেন শিউরে শিউরে বয়ে চলেছে। অবশ হয়ে গেছে দেহ, বিবশ হয়েছে চেতনা।

সালিনা হাত দুটো ধরে নিতাইকে নামিয়ে আনল মাটিতে। তারপর ঘরের পথটা ধরে। রায়েবালি নৌকাটা বাঁক ঘুরিয়ে খাল থেকে পুকুরে নিয়ে আসে। বর্ষার দিন—মেঘনার জল খাল পুকুর একসঙ্গে মাখা-মাখি করে দিয়েছে।

দুজনে ঘরে ঢুকল। কঁ্যাচ করে ঝাপ ফেলার আওয়াজ ভেসে এ'ল একটা।

এক মুহূর্তে সালিনার এই ছোট্ট চৌচালা ঘরটার বর্বর আয়তনটা ছাড়া বাইরের পৃথিবী, অতীত দিনগুলোর সঙ্গে মেশা বেনেবউ আর কাঞ্চন ফুলের গন্ধটা একেবারেই মুছে গেল নিতাইর মনের প্রচ্ছদটা থেকে।

পাঁচ

এপাড়া সে পাড়া থেকে ঢাক-কাঁসির বাদ্য ভেসে আসছে—মনসা পূজার বাদ্যি।

খাল-বিল-নদী আর ঝোপ জঙ্গলের এই দেশ। এক রাশি পথ পারাপার হতে মুকাবিলা হয় অসংখ্য কালশঙ্খিনীর সঙ্গে। এখানকার জলবাতাসে মিশিয়ে আছে বেহুলা-লখাইর কথা। দেবী বিষহরিকে তুষ্ট রাখে সকলে। ঘর ঘর পূজো। অনেকটা লক্ষীব্রতের মত।

নিশিরাত্তিরেই বিছানা ছেড়ে অনন্তহরি খালের ঘাট থেকে এক উয়াসে ডুব দিয়ে এসেছেন বিশটা। বাড়ীর পথে আসতে আসতেই গায়ত্রীটা জপে নিয়েছেন বার কয়েক। ঘরে ঢুকে বউকে ঠেলা দিলেন—"ওঠ, ওঠ।"

রসময়ী মসৃণ ঘুমে জড়িয়ে রয়েছেন। কাপড় বদলাতে বদলাতে অনন্তহরি হাঁক দিলেন—"ওঠ, উইঠ্যা পান্তা ভাত খাইড়্যা দাও। পোহাতি তারা মিলাইয়া গেল যে।"

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন রসময়ী। বিছানায় বসে বসেই চোখ কচলাতে শুরু করে দিলেন।

অনন্তহরি ইতিমধ্যে আবার পবিত্র ভঙ্গিতে গায়ত্রীটা শুরু করেছিলেন, রসময়ীর রকমসকম দেখে বেশ একটু বিরক্তই হলেন—"আঃ! একটা দিন একটু তাড়াতাড়ি করবা, তা না। চোখই ডলতে থাকে। ভোর হইলে আবার কেউ দেইখ্যা ফেলুক!"

একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙ্গে রসময়ী বলেন— "একদিন বুঝি!

পূজা-আর্চা থাকলেই তোমার ভাত খাওনের ল্যাঠা শুরু হয়।"
তারপরে চোখেমুখে জল ছিটাতে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।
একটু পরেই ঘরে এসে রসময়ী মাছ-পাতরি আর জলভাত সাজিয়ে দিলেন একখানা কাঁসার থালায়। ইতিমধ্যে অনন্তহরি নিজেকে গোছগাছ করে নিয়েছেন। ফুলকাটা আসনে এসে বসলেন ধীরে ধীরে।
সাতচল্লিশ ঘর যজমান। পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ—সাহাপাড়া, কাহার-কুমারদের তল্লাট পেরিয়ে তাঁতি-সদগোপদের এলাকা পযন্ত একলপ্তে ঘব ঘর পূজো। পূজো সমাধা হতে বেলা হেলে যায়। তাই কাকপক্ষী জাগবার আগেই তিনি পান্তা-পাতরির পালা শেষ করে ফেলেন। পেটটা ধীর-স্বস্থ থাকলে সাতচল্লিশ ঘর কোন্ কথা, সাতশ' ঘরেও পেছ পা হবেন না।
গ্রাসের পর গ্রাস নিঃশব্দে মুখে পুরছেন। কোনদিকে নজর নিরীখ করার সময়টুকু নেই। স্মিত মুখে রসময়ী বলেন— "অধর্মটা আর কইরো না।"
গ্রাসটা যেন গলার সীমান্তে আটকে গেল অনন্তহরির, বলেন—"অধর্মটা দেখলা কোথায় ?"
"আমার বাবাও তো যজমানী বামন, কিন্তু ভাত খাইয়া ভরা পেটে এ কোন পূজার ছিরি !"
আশ্বস্ত হলেন অনন্তহরি, ভাতের গ্রাসটা ধীরে ধীরে গলার সীমানা পেরিয়ে গেল। বলেন—"ওঃ এই। পেট ভরা থাকলে পূজাতে জুত লাগে। এতে অধর্মের কি আছে ?"
"তবে দিনের বেলা সকলটির সামনে খাইলেই পার।"
এবার আর কোন জবাব দেন না অনন্তহরি। মুখ গোঁজ করে থালাটা

শেষ করে ওঠেন পলকপাতের মধ্যে। তারপর খালের ঘাট থেকে আঁচিয়ে এসে ঘরে উঠলেন। তুলট কাগজে ঘন কালি দিয়ে নকল-করা চণ্ডীখানা আর নারায়ণ শিলা নামিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

সকালের সূচনা দেখা দিয়েছে পুবালি চক্ররেখায়।

খালের কিনারে একটা করমচা ঝোপ। ধীরে ধীরে তার পাশে এসে দাঁড়ালেন।

কাসেম ডিঙি নিয়ে বেরিয়েছে সাত-সকালে, যাবে বাজার মুখো।

অনন্তহরি হাঁক দিলেন—"কে রে? কাসমা না কী?"

"আইজ্ঞা ঠাকুর কত্তা।"

"যাস কই?"

"বাজারে যামু এট্টু কত্তা গোসাই"

"আমারে এট্টু সা'পাড়ায় নামাইয়া দিয়া যা।"

ডিঙির গলুই এগিয়ে দিল কাসেম সুমুখে। অনন্তহরি উঠে বসলেন নৌকার পাটাতনে।

সাহাপাড়ায় আসতেই ক'জন নৌকার গলুই চেপে ধরল। সকলেরই সমান তাগিদ।

"আমার পূজাখান আগে নামাইয়া দেন!"

"না, না আমারটা আগে। আমি সাতদিন আগে কইয়া থুইছি আপনার সেই সাজনগঞ্জের হাটে। কি কই নাই?"

এমনি নানান গলায় নানান বায়না।

বৈকুণ্ঠ সাহার উঠানে নামিয়ে দিয়ে কাসেম ডিঙি নিয়ে বাজারমুখো চলে গেল। হাত-পা ধুয়ে ফুলকাটা আসনে জাঁকিয়ে বসলেন অনন্তহরি।

ঠিকঠাক একখানা পূজা সারতে বেলা হেলে যায়। তাই মন্ত্র সংক্ষেপ করতে হয়েছে। পাঁচ-সাত মিনিটেই এক একখানা পূজার মহড়া নেন

অনন্তহরি। এমনি করিৎকর্মা। অবশ্য সব অর্চনাতেই এক মন্ত্র পাঠ করে থাকেন তিনি, ঠাকুর-দেবতার নাম ওলট-পালট করে। এ তথ্য রসময়ী জানেন। মাঝে মাঝে অনুযোগও দেন—

"শনি-সত্যনারায়ণ, শীতলা-নাটাই-চণ্ডী এক কইরা ফেলাইলা দেখি!"

অনন্তহরিও লাগসই জবাব জোগান—

"প্রভেদটা দেখলা কই? যে-ই কৃষ্ণ আবার সে-ই কালি।"

অকাট্য যুক্তি। এর পর আর কথা লতানো চলে না বুদ্ধিমানের।...

"ওং বিষ্ণু, ওং বিষ্ণু..." এই পযন্ত মন্ত্রোচ্চারটুকু দীর্ঘায়ত চিন্ময় ব্যঞ্জনায় অপূর্বভাবে উচ্চারণ করেন। তারপরই চোখ বুজে তিনি সমাধিলোকের দিকে এগিয়ে যান, এ ভূমিতে প্রবেশের এক্তিয়ার নেই কারো।

এ তাঁর একান্তভাবেই নিজস্ব মুহূর্ত।

চোখ বুজেই পৈতা ঘোরান, আতপচাল, তিল ছড়ান, কোষাকুষি নাড়া-চাড়া করেই উঠে পড়েন। ঘণ্টা নেড়ে বলেন—"জোকার (উলু) দাও বৈকুণ্ঠের বউ।"

দক্ষিণা নিয়েই একেবারে চৌকাঠের ওপিঠে। বৈকুণ্ঠ হাঁ-হা করে ওঠে—

"ঠাকুরকত্তা সিঁদা আর প্রসাদ লইয়া যান।"

"তোমরাই দাও।"

"উঁহু, সে হয় না! আপনার হাতে বাইন্ধা নেন।"

কোন ওজর আপত্তি শোনেন না অনন্তহরি। অগত্যা বৈকুণ্ঠই লাল-গামছায় বেঁধে দেয় প্রসাদ আর একডালা সিধা। আতপচাল, কাঁচকলা, করলা, সুপারী—এমনি নানান ফল তরকারি।

দক্ষিণ দিকের কাহার সাহাদের তল্লাট, তাঁতি-সদ্‌গোপ পাড়ার পূজা-

আর্চা চুকিয়ে এলেন পশ্চিম অঞ্চলে। বর্ষাকাল ; দেয়া ডাকে ঘন ঘন। বৃষ্টি ঝরে ঝমঝমিয়ে।

অনন্তহরি পারাপার হচ্ছেন এর তার ডিঙি ডোঙা ধরে। হিন্দু-মুসলমানের বাছ-বিচার নেই। হাতের স্বমুখে যাকে হোক পেলেই হ'লো। বাজার-ফিরতি কাসেম আসছিল কাহারদের নামাল জমিটার ওপর দিয়ে। ডাক দিলেন অনন্তহরি—"কাসেম এই প্রসাদ গুলান লইয়া যা। প্রসাদ-সিধার বোঝা লইয়া বিপাকে পড়ছি একেবারে।"

ফল নৈবেদ্য আর ফুলবাতাসার ভার কমিয়ে জলধরের নায়ে এসে উঠলেন অনন্তহরি। আপাতত চলেছেন কুমারপাড়া। আকাশের দিকে একবার চাইলেন। বেলা ঠাহরে আসে না মেঘবৃষ্টির কারসাজিতে।

অনন্তহরি নায়ে বসেবসেই হাত-মুখ ধুয়ে নিলেন খালের জলে ; সারাদিন মন্ত্রপাঠ করে গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। মুখ ধোয়ার অছিলায় দু এক আঁজলা জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিলেন। ভিজে ভাতের রস রয়েছে পেটে এখনও। দু প্রহরের জন্য নিশ্চিন্ত।

ডিঙি থেকে দেখা যায় ও পাশের মুসলমানদের এলাকাটা। জল ছপছপ করছে চারিকিনারে। দূর থেকে মনে হয় এক একটা দ্বীপ। জমি আর আলপথের সীমানারেখা ছাপিয়ে জল এসে উঠেছে ভিতরবাড়ীর উঠানে। মেঘনা যেন এসেছে অন্দরমহলের সঙ্গে মিতালি পাতাতে। নজরে আসে, ছেলে-বুড়ো চৌকাঠের ওপিঠে বসে পিঠালির টোপ দিয়ে বঁড়শি বাইছে জল-থলবল উঠানে। উঠছে নানান কিসিমের জলফসল। পুঁঠি, মেনি, বাঁশপাতা। এ এক অপরূপ জলছবি। অনন্তহরি চেয়ে রইলেন খানিক।

ইতিমধ্যে নৌকাটা এসে ভিড়েছে কপিলাদের বাড়ীর উঠানে। কপিলা চাকের ঘরে মনসার প্রতিমায় রঙ চিত্তির করছিল। এখুনি নিতে

আসবে গোঁসাই বাড়ী থেকে—তিন চারবার ফিরে গেছে ; রঙ দেওয়া হয় নি তখনও।

কপিলার সারাটা দেহে যেন যৌবনের খাড়া ঝিলিক। বুকটা ছ্যাৎ করে ওঠে অনন্তহরিব। জীবনের একটা বন্ধ্যা অধ্যায় মনটাকে দলে পিষে একাকার করে দেয়। বাঁজা মানুষ রসময়ী। পৃথুলাঙ্গী। তাঁকে নিয়ে জীবনের এতগুলো বছব একেবারেই নিষ্ফলা গিয়েছে। একেবারেই অতৃপ্ত। কপিলাকে দেখলেই কেমন যেন অগোছাল হয়ে যান, ওলট-পালট হয়ে যায় সব কিছু।

নৌকা থেকে চাকের ঘরে এলেন অনন্তহরি।

"আসেন, আসেন ঠাকুরদাদু।"

কপিলা একখানা জলচৌকি এগিয়ে দেয় সামনে। বলে—"বসেন।"

অনন্তহরি জলচৌকিতে বসতে বসতে বলেন—"তোগো সব ঠিকঠাক তো?"

"একটু দেরি আছে ঠাকুরদাদু; আপনি না হয় সুবলগো পূজাটা সাইরা আসেন।"

রঙ মাখানো আঙ্গুলগুলো মটকাতে মটকাতে কপিলা আড়ামোড়া ভাঙে। বলে—"সারাটা রাইত জাগছি সোয়া-শ প্রিতিমায় রঙ দিছি, কোমর ধইরা গেছে একেবাবে।"

ঘামমাখানো কপালটা হাতেব পিঠটা দিয়ে কপিলা মুছে নেয় একবার।

অনন্তহরি রসের কথা বলেন—"দরদ নাকি কোমরে? এ তো ভাবনার কথা নাতনি!"

কপিলা অপাঙ্গে দেখে। এক ঝলক হাসির বিদ্যুৎ চুঁইয়ে দেয় ঠোঁটের রেখায় রেখায়। তারপর বলে—"আপনে ভাবলে বেদনা কমবে না।"

"ক্যান্? ক্যান্?" অনন্তহরি আর্তনাদ করে সন্নিহিত হয়ে আসেন।

"ও তো জোয়ান মানুষের ভাবনা। কোন জোয়ানে যদি ভাবত—"

কপিলা চোখের কোণায় ঝড় বুনে চলে।

"আমি কি বুড়া হইয়া গেছি নাকি?" পঞ্চাশ বছরের অনন্তহরি এক লহমায় পঁচিশ বছরের সীমানায় নেমে আসতে চাইলেন। নামাবলীটা গোছগাছ করে নিলেন চকিতে। বলেন—"সাবেকী মানুষ আমি, দেখ দাত নড়ে নাই একটাও।"

কপিলা মুচকি হাসে! বলে—"আপনে সাই জোয়ান, আমি ভুল বুঝ-ছিলাম—তাই তো—"

"আমি রোজ আসুম তোর কাছে, তোরে না দেখলে পরাণ পোড়ে রে রসবতী।"

গাবের কাছে হাতটা নিয়ে আসেন।

আচম্‌কা কপিলা সরে যায় মুচকি হাসির মিহি সুবাসটা তখনও মিলিয়ে যায় নি। বলে— "ঠাকুরদাদু একদিনেই এতখানি—উঁহু, আর না।"

চকিতে নিজেকে সামলে নেন অনন্তহরি, তাই তো অনেকখানি এগিয়ে-ছেন তিনি। গলা নামিয়ে বলেন—"আমি আসুম কিন্তু নিত্যি।"

"আমার বৌঠাইনেরে চিনেন তো? জিহ্ব্যার আগায় কিন্তু বিষ আছে।"

"তোর জিহ্ব্যায় তো মধু আছে সুন্দরী।"

"উঁহু! মদ আছে।"

কপিলা মোলায়েম একটা ভঙ্গিমায় ভেঙে পড়ে।

অনন্তহরি হেসে ওঠেন—"ভালই তো মাতাল হওন যাইব তোর মুখের মদে।"

"সাবধান ঠাকুরদাদু, মাতাল হইলে মানুষে মন্দ কয় কিন্তু—"

"তোর লেইগা মানুষের মন্দরে কি আমি ডরাই রসবতী।"

ইতিমধ্যে জুতের ঘরটা থেকে কাপাসী ডাক দেয়—"আসেন ঠাকুর

গোসাঁই ; আয়োজন হইয়া গেছে।"
কাপাসী এতক্ষণ পূজার তদ্বির-তদারকে ছিল।
অনন্তহরি বলেন— "যাই, নিবারণের বউ।"
"যান, তাড়াতাড়ি যান।" কপিলা ব্যস্ততার গরজ দেখায়—"যান, আমি হাতের কামটা শেষ কইরা লই।"
"আর এট্টু বসি সুন্দরী।"
"উঁহু, অখন না, অন্য সময়।"
"আইচ্ছা, আইচ্ছা তুই যা কইস।" অনন্তহরি জলচৌকিটা ছেড়ে উঠে পড়লেন। তারপর কাপড় গুটিয়ে উঠান পেরিয়ে চলে এলেন জুতের ঘরে। পরিপাটি আয়োজন—পূজার সব ব্যবস্থাই পাকাপাকি, নিপুণ হাতে সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়েছে কাপাসী। এতটুকু খুঁত নেই কোথায়ও।
খানিকটা পরে কাসেম এ'ল। সঙ্গে গদু চক্রবর্তীর ভাগ্নে জিতেন। একটা মেটে সরায় কাঁচা দুধ আর অমর্ত্যসাগর কলা নিয়ে এসেছে এক ফানা। জিতেনকে বাজারে নিয়ে, তার হাতে এই সব উপকরণ কিনিয়েছে কাসেম। পূজা দেবে দেবী মনসার। কপিলা বলে— "ঠাকুরদাদু কাসেম আইছে দুধ আর কলা লইয়া—পূজা দিব।"
অনন্তহরি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বললেন—"কিরে কাসমা, ছুইয়া-ছাইন্যা আনছস নাকি ?"
"আইজ্ঞা না, এই তো জিতেনেরে দিয়া কিনাইছি বাজার থিকা। আইতে কি চায়! কইলাম বাবুইগঞ্জে গান শুনাইতে নিমু, তবে আইল। জিগান (জিজ্ঞাসা করুন) সুমুখেই তো আছে। এই দুধ-কলা চাচীজানের নামে ছদ্‌গা (উৎসর্গ) করবেন।"
গত সন কাসেমের চাচতো ভাইটা মরেছে সাপের ঘায়ে। চরজলমার চরে ধান কাটতে গিয়ে এই বিপত্তি। ধান কাটতে গেল অঘ্রাণের

সংক্রান্তি দিন। সপ্তাহ খানেক বাদেই বেঁধে ছেঁদে নায়ে করে নিয়ে এল সঙ্গী সাথীরা। সারাটা দেহ নীল হয়ে গিয়েছিল কালশঙ্খিনীর ঠোঁট-সোহাগে। সেই থেকে চাচী যেন তার কেমনধারা হয়ে গিয়েছে। বেহুলার অশ্রু ফল্গুধারার মত অজস্রধারায় বয়ে চলেছে এই পূব-বাঙলা, এই জলাঞ্চলের অন্তর্লীনে।

জিতেন দুধকলা রেখে এ'ল প্রতিমার দুধারে। কেন কি জানি অনন্ত-হরি শাস্ত্রসিদ্ধ মন্ত্রপাঠ করেই পূজা সমাধা করলেন। ঘণ্টাকাঁসির আওয়াজ, শুদ্ধাচার মন্ত্রধ্বনি যেন এই ছোট্ট সতের বন্দের ঘরখানার প্রচ্ছদপট ছাড়িয়ে এই গ্রাম—এমনি সহস্র জনপদের সুবিশাল পট-ভূমিতে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। হিন্দুমুসলমান নয়—আসলে মানুষ এসে যেন দাঁড়িয়েছে জীবনের অভীবচনের সুমুখে। এই পার্বণের মধ্য দিয়ে অলক্ষ্য থেকে মানুষের জন্য অভয়শঙ্খ বেজে উঠছে।

দক্ষিণা বুঝে পূজা করেন অনন্তহবি। দু আনার দক্ষিণায় দায় সারতে হয় পাঁচ মিনিটে। আবার বেশী হ'লে সময়ের মেয়াদ দীর্ঘায়ত করাব জন্য শনির পাঁচালি পাঠ করে নেন খানিক, মনে মনে সূর্যের স্তবটা আওড়ান বার পঁচিশেক। কিন্তু আজ ফাঁকিজুকি নেই এক ছিটে—সহসা এক বিরাট সত্যের মুখোমুখী এসে যেন দাঁড়িয়েছেন অনন্তহরি ভট্টাচার্য। এ অভিজ্ঞতা তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়সের প্রতিটি হিসাবী অনুপলের বাইরে। এক মহাজীবনের আভাস পেয়েছেন তিনি অর্চনার মধ্যে—নিষ্ঠার ভূমিতে যেন আবাদ শুরু হয়েছে সুমঙ্গলের।

পূজা সমাধা করে উঠে পড়লেন। কাসেম আর নিবারণ দক্ষিণা চুকিয়ে দিল।

আপাতত মনের আকাশটা থেকে একটু আগের তরল চপলতার হাল্‌কা রঙরেখাগুলো মুছে গিয়েছে। কপিলাব ধারালো যৌবন মনের

পদ্মপাতাটা থেকে একবিন্দু টলমলে জলের মত পড়ে গিয়েছে কিসের যেন একটা ঝাঁকানি খেয়ে।

ধীরে ধীরে কাসেমের নায়ে গিয়ে উঠলেন অনন্তহরি। নৌকা এগিয়ে চলেছে সুবলদের বাড়ীর দিকে। বেলা হেলে গেছে। হিজলপাতার ফাঁক দিয়ে মেঘভাঙা কাঁচা সোনার মত ঝিলমিলে রোদ এসে পড়েছে খালের জলের ওপর। কাসেমের বলিষ্ঠ কব্জি বৈঠা টানে ক্রমাগত।

সন্ধ্যা ছড়িয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ।

মিটমিটিয়ে জোনাকি জ্বলছে কেয়া-কাশের জঙ্গলে। কপিলা সাঁকোটা পেরিয়ে চলে এল তুফানীদের উঠানে। ঘরের কপাটটা ভেজান—ভিতরে কুপী জ্বলছে। একটা ভারি মিষ্টি গলা ভেসে আসছে; মনসা-মঙ্গল পড়ছে তিনকড়ি। খাওয়া-দাওয়া সেরে বাসন কোসন খালের জলে ধুয়ে নিয়ে এসেছে তুফানী অনেকক্ষণ; তারপর বেতবাঁখারি চৌরস করতে বসেছে বেঁকি দাওখানা দিয়ে। আর তিনকড়ি মনসা-মঙ্গলখানা নামিয়ে বসেছিল। ছেলেটা ঘুমুচ্ছে অঘোরে।

অনেকদিনের পাকাপাকি অভ্যাস—পুঁথি খুলে রাখা মাত্র—মুখেমুখেই বলে চলে। অসংখ্যবার পড়তে পড়তে, শুনতে শুনতে রপ্ত হয়ে গেছে কথাগুলো। তিনকড়ি সুর করে গাইছে—

কান্দিতে কান্দিতে ক'ন বেহুলা যুবতী,
ভুবনে আমার সম নাই ভাগ্যবতী
বিবাহ করিয়া নাথ লইয়া আইল মোরে,
প্রভুর সঙ্গেতে ছিলাম লোহার বাসরে—

একবার মুখ তোলে তিনকড়ি—বলে—"শুনতে আছস বউ? থুইয়া দে তোর বেতবাঁশ।"

তুফানী মিষ্টি করে হাসে—সারেঙ্গীর বাজনার মত রিমঝিম হাসি। বলে—"হ'গো শুনতে আছি, তুমি পড়।"

বাইরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে কপিলা; একটুও সাড়াশব্দ করে না। ইতিমধ্যে তিনকড়ি আবার পড়তে শুরু করেছে মোলায়েম একটা সুর ছড়াতে ছড়াতে—

জন্মে জন্মে কত আমি ভগ্নব্রত করি,
তাহাতে কুপিতা কিবা দেবী বিষহরি।
না জানি দেবীর ঠাঁই হইল কোন পাপে,
রজনীতে মোর নাথে বিনাশিল সাপে।
পতির যতেক আব সনকা জননী
শাশুড়ী কহিল মোরে দুরক্ষর বাণী।
হইল আমার মনে অতি অনুতাপ।
লইয়া প্রাণের নাথে জলে দিলাম ঝাঁপ।

নিবিষ্টমনে বেত তুলতে তুলতে তুফানী বেহুলা-লখাইর কথা শুনে চলে। সহসা মুখ তুলে তিনকড়ি বলে—"আমাগো যদি বেহুলা-লখাইর লাখান হয় বউ?"

বউ দা বাঁখারি ফেলে এসে মুখ চেপে ধরে তিনকড়ির। বলে—"ও কথা কয় না।"

ঢেমি নিভিয়ে নিবিড় আলিঙ্গনে তিনকড়ি বেঁধে ফেলে তুফানীকে।

ঘন অন্ধকার। আলো নেই এক কণা এখন কোথাযও। তবু রোশনাই জ্বলছে দুটো মনের দীপান্বিতায়।

এই মুহূর্তটা—এই তন্দ্রামদির ঘরখানা একান্তভাবেই তাদের। কপিলা এখানে অবাঞ্ছিত, চূড়ান্তভাবেই অনধিকারী। একটা দীর্ঘশ্বাসের

সঞ্চয় নিয়ে কপিলা উঠানটা থেকে নেমে এল আর ঘরের আগলে বন্দী হয়ে রইল জীবনের অমরতা।

ক'দিন নিতাই আসে নি, রথের দিন বাসাইলের খালের বাঁকে রঙ্গিলা নায়ের মাঝি যে মিলিয়ে গিয়েছিল, হিজলতলীর খালে এসে সেও নাও বাঁধে নি। ক'দিন ঘুরে এসেছে সে গোলকের তল্লাসে গিয়ে। বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে তবু রঙ্গিলা নায়ের কোন ইশারাই দেখা যায় না খালের দূর দিগন্তে। রঙ্গিলা নাও কি তবে আটকা পড়েছে কোন কেশবতীর বন্দরে ?

এখন—এই মুহূর্তে কপিলা ভেঙে পড়তে চায় তিনকড়ির মত একটা বলিষ্ঠ বুকের মোহানায়। ভারি হিংসা হয় তুফানীকে—কলিজার অনুভবে তুষের আগুন ধোঁয়াতে থাকে।

কখন খালের সাঁকোতে এসে উঠেছে খেয়াল ছিল না। নীচ দিয়ে অনন্তহরি কাসেমের ডিঙিতে বাড়ী ফিরছেন সারাদিনমানের পর। অন্ধকারেও বেশ চিনতে পারে কপিলা। বলে—"কে ? ঠাকুরদাদু নাকি ?"

"হ্যাঁ," সংক্ষিপ্ত একটা মিতবাক জবাব অনন্তহরির।

"একটা কথা কমু ?"

"কাইল আসুম।"

"আসেন, এই সাকোর উপর বইস্যা মনের কথা কই।" আবেগে কপিলার গলাটা কাঁপতে থাকে থর থর করে।

অনন্তহরি সহসা কোন জবাব দিলেন না শুধু বললেন—"কাসম। এট্টু তাড়াতাড়ি নৌকা বাইয়া চল। রাইত পার হইয়া গেছে এক প্রহর।"

আজ কোন নোংরা ময়লাকে প্রশ্রয় দেবেন না অনন্তহরি। একট

অসতর্ক মুহূর্তে অগোচর মনটা আচম্‌কা বেরিয়ে এসেছিল ক্ষ্যাপামি ভরা দুপুরে। তার জন্য এই মাত্র খেসারত দিতে হ'ল।

কিন্তু মনের মধ্যে আজ দীপান্বিতার আলো ছড়িয়ে পড়েছে। আলো-ময় হয়ে যেতে যেন ঠাহর পেয়েছেন জীবনের পরিব্যাপ্তিটা। বার বার নিবারণ পালের বাড়ীর পূজাটা স্পন্দিত হয়ে উঠছে তাঁর অনুভবে, তাঁর শিরাস্নায়ুতে। সহসাই যেন পরিচয় হয়ে গিয়েছে জীবনের চিরন্তন সুমঙ্গলের সঙ্গে।

এই যে বর্ষা—মেঘনার জলপ্রলয় এসে খালবিল ছাপিয়ে দিয়েছে, অনন্ত-হরির আজকের দিনটাও যেন মেঘনার বর্ষা ব্যাপ্তির সামিল; সমস্ত কিছু ছোটবড় সীমানা রেখাকে পরিপ্লাবিত করে দিয়েছে আজকের দিনের মহাবর্ষাটা। জীবনে আজ প্রথম পূজা করেছেন—সত্যিকারের পূজা।

ডিঙিটা এগিয়ে গেল ছলছলিয়ে। পেরিয়ে গেল তিনটে বাঁক, কাহারদের সীমানা পিছনে রেখে।

কপিলা এখনও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে মাঝ-সাঁকোতে। তার চোখ দুটো জ্বলছে সাপের মাথার মণি ঝলসের মত।···

ছয়

রাত্রে শুয়ে কপিলার মন খানিকটা জিরানি নেয়।

খাল দিয়ে নৌকা যায়—হাট ফিরতি মাঝির নাও, কেরায়া নৌকা। বৈঠা দিয়ে জলকাটার ছপ ছপ আওয়াজ ভেসে আসে খাল থেকে। শেষরাত্তিরে জেলে-ডিঙি লগি খোঁচাতে খোঁচাতে চলে মেঘনায়। ইলিস মাছের আয়াম আসছে ঘনিয়ে। মাঝিদের ভাটিয়ালি শোনা যায় কপিলার ঘরটা থেকে। কোন কোন দিন আলো জ্বালিয়ে হৈ-হল্লা করতে করতে বেরিয়ে যায় ঢপজারির দল। পরদেশী ব্যাপারীরা ভরা নিয়ে আসে নানান জিনিসের। মাল্লা-মাঝি নেমে এসে নিবারণের তাওয়া থেকে আগুন নিয়ে যায়—পাতিয়ে যায় তামাকের সম্পর্ক। এক ছিলিম টানলেই কজ্জি গরম হয়ে উঠবে—জুত হবে নাও বাইতে।

খাল নয়ত পূব বাঙলার মরমের আত্মীয়।

সত্যপীরের পাঁচালি পড়ে কেউ কেউ ব্যাপারী নৌকায় বসে—সুমুখে টেমি ধরানো। খাল-বিল, গাঙ-নদী বেহুলা-লখাইর জলবাসর পাতা রয়েছে সবখানে।

দূর থেকে দরদীগলায় কান্তকোমল মহাজন পদ ভেসে আসে এক লহব হরিসভাটা থেকে। গাইছেন গৌরহরি বাবাজী।

সন্ধ্যাবেলার মনের আগুন এখন অনেকটা নিস্তেজ হয়ে এসেছে কপিলার।

উঠান থেকে হাঁকাহাঁকি শুরু করে দিয়েছে—"নিবারণ দাদা—ও নিবারণ দাদা।"

বুকের রক্তটা যেন থেমে যেতে চাইছে কপিলার—একটা বেদিশা উল্লাসে। গোলক—হ্যাঁ গোলকই ডাকছে।

অবশেষে রঙ্গিলা নাও এসে ভিড়ল তবে কপিলার বন্দরে!

ও রঙ্গিলা নায়ের মাঝি
এই ঘাটে লাগাইওরে নাও
নিগুণ কথা কইয়া যাও—রে
আমি পরাণ পাইতা শুনি।

বানাইলের খালের বাঁকে সেদিন যে সুরের স্বপ্নটা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে গিয়েছিল দূরদিগন্তে; সেটা যেন এই মুহূর্তে আবার আয়ত্ত হয়ে এল।

একটু পরেই নিবারণের ঘর থেকে দরজা খোলার আওয়াজ এ'ল। কপিলা গড়িমশি করে করেও বিছানা ছাড়ে না। অন্ধকারের মতই একটা অজানা-অনামা লজ্জায় মাখামাখি হয়ে গেছে সে এই নেশা-জড়ানো রমণীয় রাত্তিরে।

নিবারণ বলে—"কে?"

"আমি গোলক; দাদা;—"

"আস আস, ওরে ও কপিলা; ওঠ্ দেখি কুপীটা জ্বালা।"

কপিলা মনেমনেই ফিকফিক করে হাসে। কোথায় কোন ঝোপে যেন ফুটেছে থরে থরে কাঞ্চন ফুল; হাওয়ার দমকে সুবাসের গমকটা ভেসে আসছে ঝলকে ঝলকে।

কপিলা আগুনের তাওয়া থেকে গন্ধকশলা জ্বালিয়ে কুপীটা ধরাল, তারপর কপাটটা খুলে বেরিয়ে আসে। গোলক বলে—"যাইতে আছিলাম চরজলমায়; সাজনগঞ্জের বাঁকে আইস্যা জ্বরে ধরল জবর; ভাবলাম আর কই যাই?..."

"ভাল করছ এখানে আইস্যা।"

নিবারণ ব্যস্তসমস্ত হয়ে ওঠে—"কপিলা, তোর ঘরে একটা বিছানা কইর‍্যা দে তাড়াতাড়ি; তারপর তুই গিয়া চাকের ঘরে শো।

কপিলা বিছানা পেতে দিল তরিবত করে। কাঁথাকানির ভাঙাচোরা-গুলো ঢেকেঢুকে।

গোলক এসে শুয়ে পড়ল হি-হি করতে করতে। কাঁপন ধরেছে বেজায়। তিনটে ভারি ভারি কাঁথায় বেগ মানানো যায় না।

কপিলা গোলকের কপালে হাত রাখে। শরীর তেতেছে জবর। ধান দিলে খৈ ফুটবে যেন আপনা-আপনিই—এমনি উত্তাপ। কোন কথা বলে না গোলক—জ্বরের দাপটে থরথরিয়ে কাঁপে সারাটা অঙ্গ। কপিলা কাঁধের সীমানায় নেমে-আসা লম্বা লম্বা চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালাতে থাকে। ইতিমধ্যে নিবারণ আবার গিয়ে বিছানার উম নিয়েছে—ভারি ঘুম সোহাগী মানুষ।...

পরদিন সকালের দিকে ফেনে জল মিশিয়ে, নুন জারিয়ে কটকটে করে দিল কপিলা। নাকে যাতে গন্ধ না ধরে—তাই কাগজি লেবু মাখিয়ে দিয়েছে বেশী করে। সাবুবার্লি সেই হাটবার ছাড়া পাওয়া যায় না—তাই এই দুর্বিপাক।

সকাল থেকেই জল নেমেছে ঝমঝম করে। বৃষ্টি থামে না। এবার ঋতুর আসরে বর্ষা যেন এসেছে মলখাড়ু পরে। কি সুন্দর বাজনা; রুমঝুমানি আওয়াজ বৃষ্টির নহবতে।

অবশেষে জল থামল বিকালের দিকে। কুলকুল করে ঘাম দিয়ে গোলকের জ্বরও ছেড়েছে। গা যেন এখন বরফ। কাঁথাটা গায় পেচিয়ে হাটুর ওপর মুখ দিয়ে বসে ছিল নিঃঝুম হয়ে। লালাভ চোখ। জ্বরের দাপটে

মাথা খাড়া করা যায় না যেন—কেমন একটা ভিরমি লাগে। অমন কাঠ-জোয়ান মানুষটা, কাঁথাকানি মুড়ে জবুথবু হয়ে বসে আছে—কেমন যেন লাগে কপিলার। চুপি চুপি এসে বসে পাশাপাশি। বলে—"এতদিন আস নাই ক্যান্? আমি কয়দিন খালের ঘাটে গেছি তোমার তল্লাসে। ভারি নিঠুর মানুষ তুমি।"

"কাম আছিল বলে কত?" গোলক চোখ দুটো তুলে ধরে।

"এইটা বুঝি কাম না?"

"না আকাম।"

টানাটানা চোখ দুটোর মধ্য দিয়ে একটা হাসির ঢেউ নেচে গেল গোলকের।

আর কপিলার চোখেমুখের আকাশে একটা শ্রাবণ মেঘ থমথম করতে থাকে। গোলক হাসে। বলে—"না গো নাগরী, আকাম না; আসল কাম।"

কপিলা গাঢ় গলায় বলে—"ওতো মুখের কথা।"

"না মনের।"

"কেমনে বুঝুম।"

"মন দিয়া।" গোলক কপিলার ভরা গালদুটো টিপে দেয়। তার চোখের কোলে সহসা হাসির বিদ্যুৎ ঝিলিক মেরে গেল।

মুখরা কপিলা আজ আর কথা হাতিয়ে পায় না। আচমকা বলে ওঠে—"খালের পারে কাউগাছে কাউ পাকছে—পাইড়্যা দিবা কয়টা—লাল টুকটুকা—"

"দিমু, লও যাই। আমিও খামু।"

পাছ-দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে যায় দুজনে। কাউএর ফলন হয়েছে অজস্র। গাছের আধাআধি উঠে নাড়া দেয় জোড় হাতে। বোঁটা বেজায় পোক্ত।

ফল দোল খায় মাত্র—টুপটাপ করে পড়ে না। রোখ চেপে যায় গোলকের। ধাওয়া করে মগডালের দিকে। মচকা ডাল। ভারমন্ত জোয়ান মানুষটার জবরদস্তি সহ্য করতে পারে না। কাঁথাকানি শুদ্ধ ডাল ভেঙে একেবারে খালের জলে। কপিলা ফিকফিকিয়ে হাসে। হি-হি করতে করতে পারে ওঠে গোলক। নজর চলে যায় আচমকা ওপাশের চক্রবর্তী-দের পুকুরে। জানের কাছে কৈ মাছের জাঙাল। জল ধরে আসবার পর থলবলিয়ে উঠেছে—জলের মাছ ডাঙায় উঠে মাতামাতি লাগায়। গোলকের মাছের নেশা জবর। নাওয়া খাওয়ার ফুরসতই পায় না মাছ মারবার খেয়ালে থাকলে। বলে, "কপিলা একটা খালুই লইয়া আস। কৈ মাছ মারুম।"

কপিলা খালুই আনতে ছোটে বাড়ীর দিকে। ততক্ষণ গোলক জল সাঁতরে ওপারে। খালুই এনে কপিলা বলে—"যামু কেমনে ?"

"সাতার দিয়া আইসা পড়।"

"জ্বর আইলে খেজমত করব কে ?"

"ভূতে।"

কপিলা কোন জবাব দেয় না। গাছ কোমর বেঁধে জলে নামে। জলনেঁচি শাকের ঘন জঙ্গল—পায়ে এসে লাগে ঘন ঘন। মাদার-হিজলের সারি ডিঙিয়ে জলে নামল গোলক। বলে—"খালুইটা ফিক্যা দাও কপিলা।"

দুহাতে মাছ কুড়িয়ে সামাল দেওয়া যায় না। মাদার চারাটা ডিঙাতে গিয়ে কাঁটায় লেগে আস্ত কাপড়টা ফর্দাফাঁই হয়ে গেল কপিলার।

"কাপড়টা ছিড়্যা গেল নাকি ?"

গোলকের গলার স্বরে ঘনীভূত উদ্বেগ। কাপড় মেলে না বিশেষ—হাটেবাজারে দাম বেজায় আক্রা। কপিলা বলে—"কপালে পিছা

আছে আমার, কাপড়টা বৌঠাইনের।”

কথাগুলোতে একটা জমজমাট কান্নার মেঘ—অজানা নিগ্রহের আতঙ্কে থমথমে।

খালুইটা ভরে গিয়েছে মাছে। হাত দিয়ে তুলে জান থেকে উঠে আসে গোলক। এতক্ষণ মাছের নেশায় আবিল হয়ে ছিল। তাই ঠিকঠাক নজরে পড়ে নি। ভর ভর সন্ধ্যে। আলো-আঁধারি নেমেছে দিনের প্রচ্ছদপটে। আঠারো বছরের ভরন্ত যৌবন কপিলার—সারা দেহে কানায় কানায় ভরা পাত্রের মত ছাপা ছাপি করে টলমল করে আঠারো বছরের উত্তাল বন্যা। দেহের রেখাগুলো ফুটে বেরিয়েছে—ভিজে কাপড়ে বাগ মানানো যায় না।

গোলক বলে—“কপিলা ?”

জড়ানো জড়ানো গলার স্বর। আবার যেন জ্বর এসেছে—অমন চিতানো বুকের পুরুষালি নেই গলার আওয়াজে। কেমন ভিজে ভিজে। ধরা গলায় কপিলা বলে—“কি ?”

মাছের খালুই মাটিতে রেখে গোলক হাত ধরে কপিলার। বুকের কাছে টেনে আনে তারপর—নিটোল নরম বুক। নিজের বুকে মিশিয়ে দেয়—সম্বিত নেই তখন আর কপিলার। জীবনের এক রূপমুগ্ধ পুরুষের বুকের উমে জলতরঙ্গ বাজে রক্তের শিরা-উপশিরায়। পাশাপাশি থরথরিয়ে কাঁপে দুটো হৃদপিণ্ড। পৌরুষের মোহনায় এসে মেশে নারীযৌবনের উন্মত্ত একটা ঢলক।

সুমুখের ছাড়া বাড়ীটা থেকে শিয়াল ডেকে ওঠে। সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছে অনেক আগেই—এ তারই ঘোষণা।

বরাত প্রসন্ন। কাপাসী গিয়েছে হাসারা আজ দিনতিনেক। তার

ছোট ভাইটার এখন-তখন অবস্থা। কাপড় বদলে নিপুণ হাতে সন্ধ্যা-বাতির তদ্বিরে লেগে যায় কপিলা। গোলক কাঁথাকানির ভুরপুঞ্জের নীচে আবার হি-হি করে কাঁপতে আরম্ভ করেছে।

বড়ঘরের পৈঠেতে বসে ছিল নিবারণ। সারা উঠানময় জলকাদা থক-থক করছে। পশ্চিম দিকের আকাশে আবার মেঘের সামিয়ানা দেখা যায়। ভাবা হুঁকোটা টানতে টানতে আকাশমুখো একবার নজর ফেলে নিবারণ—পেটের খাঁজে একটা আগুনের তাওয়া। পাশ দিয়ে যেতে যেতে অহেতুক বুকটা ঢিব ঢিব করে কপিলার।

নিবারণ বলে—"গোলক আছে কেমুন লো?"

"জ্বর ছাড়ে নাই অখনও।"

"একেবারেই না।" একরাশ চিন্তার মাখামাখি নিবারণের গলাটা। সারাটা দিনমান সে বাড়ীতে ছিলনা; গিয়েছিল সেই জিওলপোতায়। হাঁড়িপাতিলের জন্য মাটির তল্লাসে।

"দোখস বইন, পরের পোলা, গুণীন্ মানুষ, যত্নআত্তি করিস দেইখ্যা-শুইন্যা।"

আলগোছে জবাব দেয় কপিলা—"আইচ্ছা।"

জলদ বাজনার মত একটা তীব্র আতঙ্কে হৃৎপিণ্ডটা বাজছিল কপিলার। এতক্ষণে আশ্বস্ত হ'লো সে।

নিবারণ বলে—"গোলকের জ্বর ছাড়লে এই ঘরে পাঠাইয়া দিস এট্টু।"

এ ঘরে এসে গোলকের কাছে ফলাও করে কপিলা বলে—"বাইচা গেছি—টের পায় নাই। জ্বর কমলে তোমারে যাইতে কইছে ঐ ঘরে।"

তারপর হেসে ওঠে হি হি করে।

কাঁথাকানির ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে গোলক বলে—"জ্বর আইছিল ডরে, অখন গেছে গিয়া। এই পরথম (প্রথম) কিনা, তোমার কপিলা?"

অন্যপক্ষ নিরুত্তর। আচ্ছা বেহায়া মানুষ তো? সারা ঘরে জটিল রাত্রি থমথম করছে—অন্ধকারে কপিলার লজ্জারাঙানো মুখ ঠাহরে আসে না। উঠোন পেরিয়ে জুতের ঘরে চলে আসে গোলক। পিড়েতে জাঁকিয়ে বসে, বলে—"আমারে ডাকছ নিবারণ দাদা?"

নিবারণ হাঁ-হাঁ করে ওঠে—"তোমার না জ্বর; কপিলা কইয়া গেল।"

"এট্টু আগে ছাইড়্যা গেছে।"

"পিসীমা আছে কেমুন?"

"মা মারা গেছে সেই তৃতীয়া সন।"

সে অনেকদিন আগের ইতিবৃত্ত। গোলকের মা পালতো নিবারণকে। নিবারণের বাপ-মা মারা গিয়েছিল কোন দূর অতীতে—একটা ছায়া-ছায়া স্মরণের কুহেলিকা ভেসে আসে মনের পটভূমি জুড়ে। না—মা-বাপের কথা মনেই আসে না। পাশেই ছিল বারুই বাড়ী—দময়ন্তীর কোলে তখনও গোলক আসে নি; নিবারণকে কাঁখে তুলে নিয়ে এল একেবারে ভিতরবাড়ী। সেই ইস্তক নিবারণ বারুই বাড়ীরই একটা রক্তমাংসের অংশ হয়ে গেল। দময়ন্তীর কোলে এল গোলক। নিবারণ আর গোলক সেই থেকে পাশাপাশি বেড়েছে—সম্পর্কটা তাদের একই-রক্তের নয়, কিন্তু একই মায়ের স্তন্যরসের।

তারপর অনেকগুলো দিন আড়ামোড়া ভেঙে লক্ষ্মীপাশার মাঠচক, স্বপ্নায়ত নদী-খাল আর দিগন্তের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়েছে। কাপাসী এ'ল জীবনে। এতটা কাল পরের-ছাওয়া ঘরে মান-মাথা গুঁজে ছিল; এখন প্রয়োজন হ'ল নিজের ঘরের। কাপাসী সে ঘরের ভিটে হয়ে এ'ল; এবার সোহাগ-স্বপ্নের ছাউনি দিতে হবে স্বাবলম্বী উপার্জনের তৃপ্তি দিয়ে।

লক্ষ্মীপাশা থেকে চলে এ'ল নিবারণ; এই সাজনগঞ্জে—তুলল একখানা

ছিটে-বেড়া দেওয়া চৌচালা। লাল পাড় একখানা শাড়ী আর কপাল-ভরা একটা সিঁদুরটিপের ঐশ্বর্য নিয়ে ঐ ছোট্ট চৌচালা ঘরখানায় কাপাসী যেন এক রাজ্যেশ্বরী।

অনেক নিষেধ করেছিল দময়ন্তী। বলেছিল—"এখানেই থাক্ বৌ লইয়া, গোলক আর তুই কি ভিন্ন আমার কাছে। তোরেই বরঞ্চ আগে পাইছি।"

সেই এক গোঁ নিবারণের—নিজে আয় করবে। কোন ওজর আপত্তি শোনে নি। কাপাসীকে নিয়ে কেরায়া নৌকার পাটাতনে এসে বসল নিবারণ। আর কোন কথা বলে নি দময়ন্তী—শুধু আসার আগে কাপাসীর সিঁথির ওপর সিঁদুরের একটা বলিষ্ঠ রেখা এঁকে দিল।...

সত্যি কি তবে অনেকগুলো দিনের সাঁকো ডিঙিয়ে এসেছে নিবারণ! অনেক—অনেক দিন—খানিকটা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল নিবারণ; হুঁকোটা নামিয়ে রাখলো হাত থেকে; তারপরে ধীরে ধীরে বলতে থাকে—"কি, অসুখবিসুখ করছিল নাকি?"

"বিশেষ না; তৃতীয়া সন গ্রহণ আছিল লাঙ্গলবন্দে—গাঙে স্নান কইর‍্যা পারে উঠছে; এট্টু জ্বর-জ্বর হইছিল; বাড়ীতে আসতে আসতেই গয়নার নায়ে—"স্বরটা ভারি হয়ে থেমে গেল গোলকের।

নিবারণের চোখে ক'বিন্দু জল টলমল করতে থাকে। কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছে বলে—"যা তুই শুইয়া থাক গিয়া; জিরান বিশ্রাম দরকার।

একটা কথা বলি-বলি করেও কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকছে—অবশেষে গোলক ছেড়েই দিল কথাটা—"এই মাইয়াটা কে দাদা?" তোমার কোন সম্পর্কের বইন?

"ও আমার মামাতো বইন কপিলা।"

"ও।"—গোলক ধীরে ধীরে চলে আসে নিজের বিছানায়।

সারাটা রাত একরম বেঘুমে কেটেছে গোলকের। মাথার দিকের জানালা দিয়ে নজর চলে যায় দূর খালের জলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে। জল বাড়ছে কুলকুল করে—বাঁওড় আর নামাল জমির ওপর দিয়ে ছপছপিয়ে এগিয়ে আসছে ফেনানো জল—অনেক—অজস্রধারায়, সহস্র ভঙ্গিমায়। ও পাশে মধুটুকুরি আমের গাছটা—অন্ধকারে ঝুপসি দেখায়; বাদুড় ডানা ঝাপটায় সারাটা রাত। খানিকটা দূরে প্রদীপ জ্বালিয়ে কে যেন পদ্মপুরাণ পড়ছে সুর করে করে—

পিরদীমের শইলতাখান থরথরাইয়া কাঁপে,
বেউলাসতী কান্দে শোন বিষহরির শাপে
রাইত পোহাইলে লখাই শোবে ভেলার পালঙ্কেতে—
রে বিধির কি হইল।
একটুখানি ছিদ্র আছে লোহার বাসর ঘরে,
কালশঙ্খিনী সুতা হইয়া ভিতরে প্রবেশ করে
পিরদীমের সইলতাখান মাথা কুইট্যা মরে—
রে বিধির কি হইল।

শিয়রের দিকে শব্দ হতেই চমকে ওঠে গোলক। বলে—"কে?"

কপিলা বলে—"চুপ; আমি কপিলা।"

"এত রাইতে আসছ যে!"

নৌকা বাইতে বাইতে পিছন ফিরে গোলক তাকায় বার বার; তেমনি কোমরে হাত রেখে নেশাছড়ানো আয়ত চোখ সামনে রেখে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে কপিলা। বর্ষাধোওয়া রোদ পড়েছে সারাটা দেহে।

খানিকটা পর খালের দূর বাঁকে রঙ্গিলা নায়ের মাঝির ময়ূরপঙ্খীটা

মিলিয়ে গেল। কপিলার বুকের কোন একটা অদেখা অঞ্চল থেকে গান উঠছে—

ও রঙ্গিলা নায়ের মাঝি
এই ঘাটে ভিড়াইওরে নাও
নিগুণ কথা কইয়া যাওরে—
আমি পরাণ পাইত্যা শুনি।

সাত

দূরবিস্তৃত ফসলের ক্ষেত—একেবারে দিকচক্র অবধি।
তার পরেই আমতলীর সীমানারেখা।
একলপ্তে দু' শো কানি জমি রাঙামিলার শ্রীধর মণ্ডলের। মাঠচক এখন বর্ষার জলগুণ্ঠনে ঢাকা।
আউশ ধানের আয়ম আজকাল। ধান উঠছে—ডিঙি-ডোঙা শালতি ভরে। এসেছে নিতাই, তিনকড়ি, কান্তরা—কোমর সমান জলে নেমে নিপুণ হাতে কাস্তে চালায় সকলে। নিতাই হুশিয়ারী করে দেয়—
"দেইখ্যো ভাইরা, আমন চারা যেন নষ্ট না হয়।"
আউশের সোনা আর আমনচারার মেঘের ছাউনিটা একেবারে দিগন্ত-সীমানা পর্যন্ত।
কান্ত বলে—"না নিতাই ভাই; মার পেট থিকা পইড়্যা কিষাণী করি, আইজ কি নয়া।"
"হয়, হয়; তবু কইলাম আর কি।"
আউশের গোছ কাটতে কাটতে ধারালো ধানছরির ঘায়ে হাত কাটে কারো—সেদিকে নজর নেই এক তিল; আগাগোড়া সমানে কাস্তে চালায়। ধান ওঠে কোষ নৌকার খোল ভরে। ধানগাছের ফাঁকে কৈ মাছ ছরছরিয়ে উজিয়ে চলে। কাসেম হাতিয়ে হাতিয়ে ধরে কয়েক কুড়ি, ধান কাটার ফাঁকে ফাঁকে। শ্রীধর মণ্ডল রোজ-কৃষাণ রেখেছে অনেক—খোরাকি আর ধান দেবে এক এক ডালা। এ ছাড়া বার

মাসের জন্য লাগাবাঁধা বান্দা-গোমস্তাও আছে এক কুড়ি। দু'শো কানি জমির খেজমত করা কি মুখের কথা!

আগে আগে নিজেই আসত শ্রীধর ধানতোলা, ধানবোনার মরসুমে। লোকজন কুঁড়ে—গা-গতব মেলতেই চায় না সহজে। তাব ওপব সুযোগ সুবিধে পেলেই ফাঁকিজুকি দেয়। উপরন্তু চোর—চুরি নয়ত যেন পুকুরসুদ্ধ বেমালুম গায়েব। ধানকাটাব খন্দে একটু নজর অসতর্ক হলেই অর্দ্ধেক ধান আসবে কি না সর্বসাকুল্যে সন্দেহ আছে। বাদ বাকী ফসল ওঠে চাষী বাড়ী; ঝোপজঙ্গলের আবডালে ফেলে বেখে যেত ধানের আটি; মালিক-বাড়ী তোলার সময়। তারপর সুবিধেমত বাড়ী নিয়ে তোলে। তাই এদের সঙ্গে বনিবনা হয় না শ্রীধরের। সব-সময় খিটিমিটি লেগেই ছিল।

সেই রাত্তির—যে রাত্তিরে সরলা কার্তিকের সঙ্গে নিখোঁজ হ'ল মেঘনার সীমান্ত শেষে; নিতাই কোষ নাওটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, নৌকা ছেড়ে দিল স্রোতের খেয়ালে। আর কোনদিন ঘরে ফিরবে না। অবশেষে সেই যাযাবরী নৌকা এসে ভিড়ল রাঙামিলায়—ধানী গৃহস্থ শ্রীধরের ঘাটলায়। সেই থেকে এই সংসারেব নাড়ীতে জড়িয়ে আছে নিতাই, পাকে পাকে।

ভাবি বিশ্বাসী মানুষ।

শ্রীধর চাষ আবাদের ঝক্কি-ঝামেলা নিতাইর মাথায় তুলে দিয়ে খালাস হয়েছে, আসান হয়েছে অনেকটা; বিত্ত-বেসাতের জট কি কম পাকিয়েছিল! নিতাইকে পেয়ে সুরাহা হয়েছে যেন একটা বিষম মামলার।

চরের জমি শ্রীধরের প্রায় নব্বুই কানি। বেশ চৌরস জমি। ধান ওঠে বিস্তর।

সে সন আউশ উঠলো। জলের সেবার বেজায় জবরদস্তি। বুক সমান জলে নেমে ধান কেটে ছিল নিতাই। একটা শিষ্‌ও বেহদ্দ খয়রাতি হয় নি। আগের সন যে ধান উঠেছিল তার দুনো উঠলো সেবার। খাটিয়ে-পিটিয়ে মানুষ—একা বিশ জনের কাজের সামাল দেয়—এমনি তাগদ বলিষ্ঠ পেশীগুলোতে।

শ্রীধর ভারি সুপ্রসন্ন। নিতাইকে পেয়ে যেন একটা দামী তালুক হস্তগত হয়েছে। ছেলেপুলেগুলো একটাও মানুষ না—ফুলেল টেরী বাগিয়ে ময়ূরপঙ্খী ভাসিয়ে চলে খালের জলে—যদি কোন রাজকন্যার নজর ধরতে পারে। সব শয়তানের ছাও।

মুখ বুজে তিনকড়ি কাস্তেটা চালাচ্ছিল।

কাসেম কাঁচা রঙ্গ করে—"একলা যে থুইয়া আস চাচীরে, ভাল না—উঁহু ভাল না। যৈবনের বিরহে তোমার পরাণবন্দু না আবার এক-মুখি বাইর হইয়া যায়।"

"বিরহটা দেখলি কই?"

কান্ত রসের চাপান দেয় রঙদার প্রসঙ্গটায়।

তিনকড়ি হাসে আলগা আলগা। বলে—"তোরা গিয়া পাহারা দিলেই পারস।"

কান্ত বলে—"হয়, হয়; তাই যামু, কিন্তু ঠোকনা যদি দিয়া দেয় গালে।"

তিনকড়ি জবাব দেয় না—শুধু হাসে মিটি মিটি।

ইতিমধ্যে কাসেম কান্তের আগের কথার জোয়ালটা চেপে ধরে। বলে—"বিরহ না! সারা দিনমান চাচায় থাকে চকেমাঠে। নিড়ি দেয়, ধান কাটে; কলই তোলে। চোখাচোখি হইতে সেই এক পহর

রাইত। আবার ঘর থিকা বাইর হয়; পোহাতি তারা থাকে আকাশে।"

সিকিমালি মাথা ঝাঁকিয়ে তারিফ করে কাসেমকে—"ঠিক; ঠিক।"

তিনকড়ি বলে—"মস্করা রাখ এখন বাক্সে তুইল্যা, তিনরোজের মধ্যে ধান কাটা সারা করতে হইব সে খেয়াল আছে?"

"আছে গো চাচা আছে।"

নিতাই তামাক টানতে টানতে ডিঙ্গির ওপর থেকে মোক্ষম মন্তব্য করে —"খুড়ার অন্তরে বিন্ছে (বিঁধেছে) বাক্যিখান। তোরা বেবাক আহাম্মক; জানস খুড়ী কি আন্দাজ তোয়াজ করে খুড়ারে? কি কও খুড়া?"

কথার একটা ঠেলা দেয় নিতাই—তিনকড়ির মনের পিঠে ধাক্কা লাগে জবর।

বিয়ের পর দুটো বছর গড়িয়ে গিয়েছে, তবু তুফানীর নিবিড় সান্নিধ্য এখনও তাজাতপ্ত। মনে আকুলি বিকুলি লাগে তিনকড়ির–সত্যি সেই মুখ-আঁধারি থাকতে ঘর বিছানায় তুফানিকে ছেড়ে আসতে হয়। পোহাতি তারা থাকে তখন আকাশে।

তিনকড়ি বলে— "কল্কিটা দে তো নিতাই। এট্টু জুত কইর‍্যা টাইন্যা লই।"

এরি মধ্যে এক মালসা তামাক পুড়েছে কল্কির চিতায়। একটা হিজল পাতা দিয়ে কল্কির গোড়াটা ধরে নেয়—বড় গরম হয়ে গেছে; তারপর জুত করে দীর্ঘ-ছন্দে একটা টান দিল তিনকড়ি। কান্ত-কাসেমরাও তামাকের বখেড়া মিটিয়ে কাস্তে নিয়ে মাঠে নামে।

জোরমন্ত বর্ষা।

চরজলমা, আউশখালি, আবদুলাপুরের মাঠচক ডুবিয়ে মেঘনা আসছে

হু হু করে। এই সাজনগঞ্জ, রাঙামিলা, ইনামগঞ্জ পেছনে রেখে জল ছুটছে পশ্চিম মুখো; মেঘনার মেঘকালো জলের সঙ্গে ভেসে আসছে কচুরী পানার জঙ্গল—আর এই ঢলের মতই অজস্র মাছ; মেঘনার রূপালী ফসল—ধানচারার ফাঁকে ফাঁকে মাছের মা কামনা ছড়াবে—পাড়বে লক্ষ লক্ষ ডিম।

সিকিমালি বলে—"এই সব খালে বিস্তর মাছ।"

ছোট খাল—নাম ময়নামতী। গাঙ-খাল-বিলের সঙ্গে বসতি—একরকম সহবাস, তাই জলতলের সব কিছুই এদের নখমুকুরে। কোথায় ক' ধবজি জল, কোথায় বোয়াল মাছের আস্তানা—কিছুই অজানা নেই। চোখ বুঁজে বলে দেবে—যেন কত ঘরোয়া কথা বলছে পরিপাটি করে।

কান্ত বলে—"এই বার খান কয়েক বাঁশ নিমু মণ্ডল বাড়ীর ঝোপ থিকা। 'চাই' বানাইতে হইব। মাছের দিন আইস্যা গেল।"

ধানের গোছে পোঁচ দিতে দিতে দিতে সিকিমালি বলে—"রায়েবালি সে দিন 'জিওল' দিয়া মাছ ধরছে গাঙ থিকা। বিরাট এক এক বোয়াল, চিতল—এক খালুই কৈ যা পাইছে! ল যাই একদিন ভেসাল জাল লইয়া গাঙে যাই। কান্ত যাবি নাকি সোমবার।"

কান্ত উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বলে—"যামু আমরা।"

বসময় বলে—"আর যাইব না কেউ?"

"আর যাইব কে?"

"নয়া খুড়ী না গেলে খালুই ধরব কে? মাছ রাখুম কিসে?"

ফসল-কাটা কাস্তে উঁচিয়ে তিনকড়ি বলে—"খাড়াও মজাখান দেখাই তোমারে; হারামজাদা—সব সময় তোমার ঠাট্টা-মস্করা।"

কান্ত গম্ভীরে ধান পাঁজা করে রাখে নৌকার খোলে—এ সব কিছুই যেন

জানে না; এমন একটা ভাব আকারে-প্রকারে। সিকিমালি আর রসময়রা শোরগোল তুলে হাসাহাসি করে।

নিতাই ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে ডিঙি চালায় সোঁ সোঁ করে; তল্লাস নেয় এ ক্ষেত সে ক্ষেতের; দু'শো কানি আউশের চক—মুখের কথা! নজর নিরীখ করে খরভাবে। কেউ যেন ফাঁকিজুকি না দিতে পারে তার জন্য তীক্ষ্ণ সতর্কতা।

ধানের বিল থেকেই বেশ দেখা যায়—দূরের ভিটেগুলো এক একটা ভাসন্ত দ্বীপের মত। চারপাশে মেঘবরণ জল ছপ ছপ করে!

একটা কলাগাছের ভেলা বানিয়ে বেরিয়েছে নবলাল। হাতে একটা ধারালো জুতি—মাছ মারবে এমনি মতলব। শিকারী চোখ দুটো একাগ্র হয়ে সন্ধান করছে জল জঙ্গল—এতটুকু যদি উলাস পাওয়া যায় শোল-গজারের।

নিতাই বলে—"কি ভাই নবলাল, সুবিধা হইল।"

নবলালের জবাব দেওয়ার ফুরসতটুকু নেই—শুধু বলে—"হুঁ।"

ভেলাটা ভাসতে ভাসতে বেরিয়ে গেল সামনা দিয়ে। নিতাই আরো দুটো তেজী খোঁচা দিল লগির। এগিয়ে এল একেবারে দক্ষিণের চকে। কি যেন দেখল এক পলক—তারপর লগির কেরামতিতে নৌকাটা নিথর করে দিল নিস্তরঙ্গ জলের ওপর। ধানচারার ফাঁক দিয়ে এক ঝাঁক তামাটে তামাটে শোলের পোনা বেরিয়ে এল আলপথের ওপরকার মসৃণ জলসমতলে।

নৌকার খোল থেকে জুতিটা নিয়ে উঁচিয়ে ধরল নিতাই। শোলের তামাটে পোনাগুলো কিলবিল করে খেলা করছে বেদিশা উল্লাসে।

একেবারে অব্যর্থ সন্ধান—নিতাই জুতিটা একবার শূন্যে তুলে ছুঁড়ে দিল তাক ঠিক রেখে। এপিঠ ওপিঠ হয়ে গেছে জুতির শাণানো ফলাগুলো।

মাছটা টেনে তুলল ওপরে—এক হাত আর এক মুঠুম হাত লম্বা—ওজন হবে পাঁচ সেরের কাছাকাছি। চোখ দুটো চকচক করে উঠল নিতাইর পরিতৃপ্তির খুশিতে। মাছটা গজার···

আর একবার উল্লাসের ঝিলিক লাগলো চোখের আনাচে কানাচে।

ক' রাত্রি ধরে যেন স্বোয়াদ পেয়েছে একটা মধুর উন্মাদনার। একা বিছানায় রাত্রিটা ভারি নিষ্ফলা লাগে—মনের ভিতর থেকে যেন নিশিতে ডাকে। মধ্য রাত্তিরে উঠে উঠে তাই এ কটা দিন নৌকা এনে ভিড়িয়েছে সালিনাদের ঘাটলায়। সারাটা দেহ যেন সালিনার গন্ধ মাখামাখি হয়ে রয়েছে।

মাছটা নৌকার খোলে ভরে কাপড়টা মাজায় গুটিয়ে লগি দিয়ে একটা খোঁচা দিল জলের নীচের মাটিতে। নৌকার গলুই ঘুরে উত্তর দিক দিয়ে এসে নামল খালের ওপর। লগি রেখে তারপর বৈঠাটা হাতে তুলে নিল নিতাই। জল কেটে কেটে ডিঙি এগিয়ে চলল ছপছপ করে।

সালিনা—হ্যাঁ আজকাল নিতাইর চোখের আয়নায় পৈরীর মতই খবসুরত মনে হয়। অনেকগুলো কাঁচা টাকা জমিয়েছিল নিতাই—সবই সালিনার হাতে তুলে দিয়েছে। ক্ষতি তার হয় নি। অনেকগুলো রাত্রিই তো সালিনা আবাদে-ফসলে ভরে দিয়েছে নিতাইর জীবন। আজ বহুদিন পরে অনসুরা গলাটা আবার আকুল হয়ে উঠল তার। গাইছে—

বউন্যা ফুলের মালা গাইথ্যা
দিব তোমার গলেতে
হে সোনার বরণ রাজকইন্যা,
ময়ূরপঙ্খী নাও ভিড়িল ঘাটে গো
কেশবতী রাজকইন্যা চোখ মেলিয়া চাও—

সরলা তার মনের জমিতে লগির খোঁচা দিয়ে নাও নিয়ে পাড়ি জমিয়েছে কোথায় কে জানে? কিন্তু খোঁচার ঘা'টা অনেকদিন পর্যন্ত তরতাজা ছিল—সালিনা সোহাগ-পীরিতের পলিমাটি দিয়ে সেই ঘা'র চিহ্নটা মুছে দিয়েছে প্রায়। তবু অজান্তে দীর্ঘশ্বাস আসে, চোখ ভরে যায় চকচকে জলে, পরাণটা কচ কচ করে ওঠে নিতাইর। না আর ভাববে না সরলার কথা—সালিনার ঝড়-তুফান দিয়ে মন থেকে সরলার ছাউনি উড়িয়ে দিবে।

বৈঠাটা টানতে থাকে নিতাই তেজী কব্জির জোরে।

'সোনার বরণ রাজকইন্যা' ঘাটে এসেছিল মেটে সানকি ধুতে।

নিতাই নৌকা ভিড়য়ে বলে—"এই নে সালিনা, মাছটা ধরলাম জুতি দিয়ে—"

সালিনা খলবল করে ওঠে। বলে—"সাই গজার তো—"

ইতিমধ্যে ওদিক থেকে রায়েবালি নৌকা হাঁকিয়ে আসছিল—সুমুখের গলুইর মুখে ফেনার ফুলকি ফুটিয়ে। একেবারে হৈ হৈ করে ওঠে— "স্বোয়াদ পাইছ তো দোস্ত, মন বুঝি ফুকুর-ফাকুর করে। উঁহু, এ তো ভাল না; মানুষে নষ্টমন্দ কয়।"

মাছটা হাতে নিয়ে সালিনা ওপরে উঠেছে, ঝিলিক মেরে হেসে ওঠে —"কউক, কইলে তো আর ফোস্কা পড়বে না।"

নিতাই থতমত খায়। বলে—"আমি যাই।"

বৈঠার ঘায় ঘূর্ণি ওঠে জলে। এগিয়ে চলে কোষ নাও।

পিছন থেকে রায়েবালি বলে—"আরে খাড়াও ভাই, আমিও যামু।"

রায়েবালিও বৈঠা চালিয়ে আসে এগিয়ে। অনেকদূরে ছোট্ট একটা দ্বীপের মত ভাসন্ত ঘরের পৈঠেতে ঠায় দাড়িয়ে আছে সালিনা—হাতে ঝুলানো সেই গজার মাছটা।

নিতাই অন্য কথায় আসে। বলে—"গেছিলা কোথায় ?"

রায়েবালি খল খল করে অনেক কথা বলে—"কুটুমবাড়ী গেছিলাম সেই চরজলমায়। ফুফাত বইনের সাদি—খুব মেজবান খাইলাম; একেবারে পাকা ফলার। রাতভর জারিগান হইচে—হৈ চৈ।"

"তুমি কত্তারে কইয়া যাও নাই। তালাস করছিল সকালে।"

নিতাই কথা পালটায়।

"কি করি কও, কাইল হাটে গেছিলাম ইনামগঞ্জের। ফুফাত ভাই-এর লগে দেখা; কিছুতেই ছাড়ল না; কি করুম কও।"

রায়েবালিও মণ্ডলবাড়ীর চাষী গোমস্তা। নিতাইর সঙ্গে এক হয়ে কামকাজ করে।

সন্ধ্যার আগাআগি মেঘ করল; সারা দক্ষিণ আকাশটায় ফাঁক নেই একটা কুটো ফেলবার।

এমনই জলভার ঘন মেঘ। তিনকড়ি আকাশের দিকে চোখ ছড়িয়ে দেয় – বলে—"বিষ্টি-তুফান আসবে মনে হয়।"

সিকিমালি সায় দেয়—"সেইরকমই লাগে যেন।"

বলতে বলতেই জল নামল চেপে।

কান্তর মবলগ বুদ্ধি। বলে—"এইবার যাওয়া যাউক : আইজের মত থাউক ধান-কাটা।"

নিতাইর মনে ধরে কথাটা—"হয়, হয়; ঠিকই কইছ।"

খান পঞ্চাশেক ডোঙাডিঙি একটা মিছিলের মত খাল পথ দিয়ে এগিয়ে চলল। ধানের সোনায় ভরা সব ক'খানা নৌকাই।

ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে ঢালা উঠানে ধান এনে টাল দিয়ে রাখে সকলে; ভিজে একশা হয়ে গেছে কান্ত-কাসেমরা। সিকিমালি বলে—"শীগ্‌গির

ঘর যে হাতে তুলল নিতাই, সে হাত তো সরলার জন্যই ছিল প্রস্তুত —বর্ষার দমকা বাতাসের মত একটা দীর্ঘশ্বাস হু-হু করে বেরিয়ে গেল বুকেব মধ্য দিয়ে—উঃ—সরলা এখন কোথায়? কে জানে?

খানিকটা পর দশ ঝাঁক উলুর আওয়াজ ভেসে এ'ল। কচি গলার একটা কান্নার শব্দকে দাবিয়ে শাঁখের দমক উঠল এক পশলা।

আরও খানিকটা পরে আবার দশ ঝাঁক উলু, অনেকগুলো শাঁখের আওয়াজ আর একটা নরম গলার শব্দ উঠল উল্লাসের জোয়ারে তরঙ্গায়িত হয়ে।

দশ মিনিট আগু পিছু খালাস হয়েছে দুই পোয়াতি। হিরণীর হয়েছে কোলভরা ছেলে আর মিলনীর কলিজা পোড়ানো একটা মেয়ে।

নিতাই ঠায় বসে রইল অন্ধকারে—একেবারে নিঝুম, চুপচাপ।

কাপাসী হাসারা থেকে ফিরে এসেছে দিনকয়েক হ'ল।

ছোট ভাই তার অন্ন পথ্য করেছে। এ যাত্রা বড় সারা সেরে গেছে জীবন। গ্রাম দেশ, উপরন্তু বর্ষা কাল—ডাক্তার কবিরাজ অগ্নিমূল্য—চড়া দাম ওষুধজলের। একরকম পরমায়ুর জোরে চিতায় উঠতে হয়নি জীবনের। যাক্—নতুন হাঁড়ি পাতিলগুলোর পেছন থেকে কাপাসী টেনে বার করে আনল কাপড়খানা। দলামোচড়া করে গুজে রেখে-ছিল কপিলা। সে দিন গোলকের সঙ্গে মাছ কুড়াতে গিয়ে মান্দাব কাঁটায় লেগে দু ফালা হয়ে গিয়েছিল।

কাপড়টা বের করে একেবারে মারমুখী হয়ে উঠল কাপাসী; একেবাবে আনকোরা নতুন কাপড়—গত বৈশাখে মা পাঠিয়েছিল হাসারা থেকে। একেবারে কঁকিয়ে ওঠে মর্মচেরা গলায়—"সব্বোনাশ হইচে—আমাব সব্বোনাশ হইচে।"

শোল মাছের পোনার মত একপাল ছেলেমেয়ে সরে গেল আশপাশ থেকে। ব্যাপারটা বিশেষ সুখসুবিধের নয়। মাকে তারা চেনে বিলক্ষণ।

নিবারণ উঠানের এক কিনারে এ টেল মাটিতে জল আর বালি মিশিয়ে চৌরস করছিল। হাঁড়িপাতিল হবে, এই মাসের শেষাশেষি গাওয়ালে বেরুতে হবে চরের দিকে। বোরো ধান না আনলে সারাটা বছর সংসার কুঁদবে কার জোরে। যত ধান্দা তার মাথায় দিয়েছিল ভগবান! পোষ্য কি কমগুলো! মনে মনে গজগজ করতে থাকে নিবারণ।

কাপাসীর গলাটা ধীরে ধীরে অনার্য হয়ে উঠছে—"পোড়াকপালী, নিঃবংশী—বাপ মা তো খাইছেই এইবার আইস্যা ঢুকছে এই সংসারে—"

নিবারণ বিরক্ত হয়, মুখ তুলে ঐ জামরুল তলা থেকেই বলে—"এই সকালে আবার কি হইল বউ? এট্টু চুপ কর দেখি!"

কাপাসী থামে না। গলা চড়ায় আসমান-সমান উঁচু করে, বলে—"ভগমান! তোমার মনেও এত আছিল, ক্যান যে এই পোডা-কপাইল্যা সংসারে আমারে আনলা—"

কাজে মন লাগে না নিবারণের, বেজায় বেজার-বিতৃষ্ণা আসে; সকাল থেকেই এই কান্না-ককানির ঝামেলা কার ভাল লাগে! কপাল ঘুচিয়ে আবারও বলে—"চিল্লানি থামা; ভাল যদি চাস।"

কাপাসী গলার পর্দা তোলে অনেকটা—"আমি চিল্লামু আমার খুশি, তোর কাম তুই কর না। চিল্লাইব না—ওর ডরে। তোর সোহাগের বইন যে আমার কাপড়টা ছিড়চে—"

"ছিড়চে, বেশ করছে, এইবার ক্ষ্যান্ত দে চিল্লানিতে।"

"না, দিমু না কিছুতে, আমার ইচ্ছা আমি চিল্লামু।"

কাপাসী একটা বন্য গলায় বলতে থাকে। "আমার মায় দিছে কাপড়, তোর বইনে ছিড়নের কে? ভাত দেওনের ভাতার না, কিল মারণের গোসাঁই।"

"বেশী কথা কইস না, ভাল হইব না। এক ফির ছিড়চে—আমি কইয়্যা দিমু আরও দশ ফির ছিড়তে, এইবার চুপ মাইর‍্যা থাক।"

নিবারণ জামরুলতলা থেকে শাসাতে থাকে।

কাপাসী ফুঁসিয়ে ওঠে—"ভগমান এই নিঃবইংশার লগে আমার নির্বন্ধ করছিলা; সব সময় বইনের দিক লইয়া কথা কয়; তলে তলে কি আছে তুমিই জান ভগমান।"

একটা নোংরা সন্দেহের চাকে তীব্র খোঁচা দেয় কাপাসী। নিবারণের হাত-পা গুলো একটা খাড়া ঝিলিকের ঘায়ে ঝনঝন করে ওঠে। লাল লাল দুটো চোখ তুলে বলে—"চুপ মার বৌ, না হইলে একবারে খুনই কইর‍্যা ফালামু।"

"একটা কথাও কইতে যদি না-ই পারুম তবে তোমার সংসার খেজমত করতে পারুম না আমি। একটা নাও ডাক দিয়া দাও, আমি হাসাবা যামু আইজই।"

কাপাসী নাকিয়ে নাকিয়ে বলতে থাকে কথাগুলো।

"যা বাইর হইয়া যা, এই মুহূর্তে, সব পোলাপান লইয়া যাবি।"

নিবারণ ঝলসে ওঠে। কাদাছানা হাতদুটো নাড়তে থাকে বার বার। "পোলাপান তো তোর ড্যাকরা; আমার না কি রে নিঃবইংশা। এই শূয়রের পাল আমি নিমু ক্যান, তোরটা তুই-ই দেখ; আমার গরজ পড়ছে ভারি।"

কাপাসী শুকনো নাকের ওপরকার বেসর নেড়ে খন খন করে ওঠে ভাঙা কাঁসির মত।

নিবারণ আবারও বলে—"এই গুষ্টী কি আমার, সব তোর পাপে হইচে, বছব যাইতে না যাইতেই খালি … !"

কাপাসী আচমকা স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপর বলে—"শোন ভগমান, ড্যাকরা কয় কি? আইচ্ছা আমি যামু গিয়া পোলাপান লইয়া, তুমি থাইক্যো স্বোয়াস্তিমত।"

"থাকুমই তো, এই যে গেছিলি, শান্তিতে আছিলাম।"

এক মুহূর্ত স্তব্ধ চোখে চেয়ে রইল কাপাসী, তারপর ধীরে ধীরে বলে—"বইনেরে লইয়া নতুন কইর‍্যা সংসার পাইত্যো।"

"আবারও; ছোটলোকের বাচ্চা—"

একটা দেয়া যেন ডেকে উঠল আচমকা। নিশ্চুপ হয়ে গেল কাপাসী। ইতিমধ্যে কপিলা খাল থেকে ফিরেছে বাসনকোসন ধোয়ামাজা করে। উঠানে ঢুকতে না ঢুকতেই কাপাসী গর্জিয়ে উঠল—"পোড়াকপালী, সব খাইব। বাপ-মা খাইয়া এইবার আমার হাড়-মাংস চিবাইতে আইছে, ক্যান, এত মানুষের সঙ্গে আনাগোনা, একজনের লগে গেলে গিয়াই পারে। আমার কাপড়টা কোন অপরাধ করছিল তোমার ছিরিচরণে।"

বলেই চৌকাঠ ডিঙিয়ে পাকের ঘরের কাছাকাছি চলে আসে। বেড়ার গায়ে ঠেসান দেওয়াছিল চাকের লাঠিটা, তুলে নিয়ে বেদম ঠেঙাতে থাকে। কপিলা কাঁদেনা, কাঠ হয়ে রয়েছে একেবারে। নিবারণ এগিয়ে এসে লাঠিটা ছিনিয়ে নেয়, ফেলে দেয় ওপাশের ছিটালে; তারপর বলে ওঠে—"যাউক কাজ-কাম, কর তোরা খাওয়া খাওয়ি। দেখি কয় দিন তেল থাকে শরীরে, পেটে ভাত না থাকলে।"

আর দাঁড়াল না সে এক দণ্ড। হন হন করে চলে গেল বাইরে। মধুটকুরি আমগাছটার শিকড়ের ওপর বসল পা ছড়িয়ে। সামনে

ময়নামতীর খাল বেয়ে এগিয়ে আসছে মেঘরঙা জল আর অজস্র কচুরী পানা—সোঁ—সো আওয়াজ ওঠে তোড়ের ফোঁসানির।

মনটা এই সকাল বেলাতেই ভারি বিস্বাদ হয়ে গেল।

কেমন যেন হয়ে গেছে কাপাসী। সব সময় খাওয়া খাওয়ি—একটা দণ্ডও সুস্থির হয়ে দুটো মনের কথা বলবে—তার যেন ফুরসতই পায় না—

অথচ—অথচ—

ময়নামতীর ফেনানো ঢেউ-এর ওপর দিয়ে সহসা কাঁচা বয়সের বৃত্তান্ত ভেসে আসতে থাকে ঝলকে ঝলকে—সেই সব বেপরোয়া দিন!

দময়ন্তীর সিঁদুর টেনে দেওয়া সিঁথি আর উজ্জ্বল কপালের লালটকটকে টিপটায় ভারি মোহময় মনে হ'ত কাপাসীকে। নাকের বেসর আর কানের বনফুল দোল খেত ঝুমকালতার মত। দুটো হাবা-হাবা চোখ উচিয়ে ধরত নিবারণ; হাতের কাজ মাটিতে পড়ে গেছে, সে দিকে নজর নেই এক কুচি।

ডুরে শাড়ীর কালো পাড়ের আগায় আগায় মনটা মিশিয়ে যেত যেন কখন—অন্যমনা হয়ে যেত নিবারণ। খালঘাট থেকে ফিরে এসে কাপাসী দেখত ঠায় বসে আছে।

মনে মনে খুশিতে ফেটে পড়বার উপক্রম কাপাসীর। সোজাসুজি সামনে এসে দাঁড়াত; সরল চোখের তরল দৃষ্টি ছড়িয়ে বলত—"সকাল থিকা তো ড্যাবড্যাবা চৌখ দিয়া গিলতে লাগলা আমারে, শেষে ভাতের ক্ষিদা থাকব তো!"

"না থাকলেই বা কি?"

নিবারণ হাসত মিটমিটিয়ে।

বেসর ঝাঁকিয়ে কাপাসী গিয়ে উঠত পাকের ঘরে। আধাআধি খোলা

ঘোমটার আবডাল থেকে একরাশ তেল-জবজবে চুলের মেঘে কি মোহই না ছিল সে সব দিনে!

প্রথম গর্ভ হ'ল কাপাসীর। পাঁচ মাসের মাস সেই—কোথায় বনবিবি-তলার সাধুর মন্ত্র পড়া মাদুলি এনে বেঁধে দিল ওপর হাতে। যে যা বলছে—হাওয়ার আগে গিয়ে তাই করছে কাপাসীর জন্য। রাতভর ঘুম নেই, স্বোয়াস্তি নেই একছিটে, ভালয় ভালয় ভগবানের ইচ্ছায় খালাস পায় কাপাসী! যদি একটা খারাপ মন্দ কিছু— না, না আব ভাবতেই পারে না, নিশ্চিন্তে ঘুমও আসে না।

ছ'মাসের মাস জিওলপোতা থেকে এক দূব সম্পর্কের পিসীকে নিয়ে এ'ল নিবারণ। অচল অবস্থা কাপাসীব, রান্নাবান্না, চলানো-ফেরানোব জন্য একজন লোকের প্রয়োজন সব সময়।

কাপাসী শোলের পোনার চচ্চড়ি ভালবাসে, সকাল হতে না হতেই নাও নিয়ে ছুটল নিবারণ, ধান ক্ষেতে, গামছা দিয়ে ছেঁকে নিয়ে এল অজস্র মাছের পোনা।

পিসী হাসে; হেঁশেল নাড়াচাড়া করতে করতে বলে—"তুই-ই দেখালি নিবারণ, আর কারো বউ বিয়ায়, না পোয়াতি হয়! খালি তোব বউই হইছে। ধন্যি স্বোয়ামী পাইছিল তোর বউ!"

নিবারণও বোকা-বোকা হাসি হাসে, বলে—"তুমি বোঝ না পিসী, তোমরা সাবেকী মানুষ।"

পিসী বলে—"হ, তোরা তো আমাগো পেটে হ'স নাই, আমবাই তোগো পেটে হইছি।"

নিবারণ আর কথা বাড়ায় না, পিসীর যা মুখ আলগা, কখন কি বলে বসে। আস্তে আস্তে সরে যায় পাকের ঘরের পৈঠে থেকে।

মাঝে মাঝে খুনসুড়ি হ'ত, ভারি মিঠা মিঠা ঝগড়া।

নিবারণ বলত—"মাইয়া হইলে তোর, পোলা হইলে আমার।"
কাপাসীই মিটিয়ে দিত স্বোয়ামীর মুখে মুখ রেখে—"পোলা হউক আর মাইয়া হউক আমাগোই ; আমাগো দুইজনের মধ্যেই শুইব।"

"হয়, হয় ; ঠিক কইছিস।"

নিবারণ কাপাসীর চুল চটকাতে চটকাতে সায় দেয়। ভারি মনের মত বৌ হয়েছে তার। সেই কাপাসীই ওলটপালট হয়ে গিয়েছে। সেই তেল-জবজবে চুল, কেমন যেন রুক্ষু রুক্ষু হয়েছে। সিঁথিতে টেনে-দেওয়া দময়ন্তীর সেই উজ্জ্বল-লাল সিঁদুরের বর্ণটাও কেমন যেন ফেকাশে ফেকাশে হয়ে গেছে। ছেলেপিলে হয়েছে এক গোষ্ঠী।

মামাতো বোনটাকে সংসারে এনে তুলবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন জঙ্গী জঙ্গী হয়ে উঠেছে। ননদ-ভাইবৌতে বনিবনা নেই একদণ্ড। সব সময় চুলোচুলি বেধেই আছে। প্রাণ-বাতাস প্রায় ঠোঁটের কিনারে এসে গিয়েছে নিবারণের।

দু প্রহর বেলা পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। মেঘভাঙা সূর্যটা হিজল-গাছের মাথায় এসে উঠেছে। রোদ ছড়াচ্ছে ঝিলিমিলি। কপিলাই অবশেষে ডাকতে খুঁজতে আসে।—"আস দাদা, মুড়ি খাইয়া যাও, দুইপহর বেলা চড়ছে।"

হাত ধরে সাধাসাধি শুরু করে দেয় কপিলা।

নিবারণ বলে—"তুই যা, আমি যামু এট্টু পরে।"

কপিলা হাত ছাড়ে না।

জুতের ঘরের জানালা দিয়ে চোখ দুটো ছুঁড়ে দেয় কাপাসী ; বলে—
"হয় হয়, যুগলমিলন হইচে এইবার, ঠিক এই চাইছিলাম।"

আচমকা রক্তটা যেন মাথায় চনচন করে ওঠে। কোথা দিয়ে কি হয়ে

গেল। কপিলার হাত দুটো ছাড়িয়ে একেবারে সাঁ সাঁ করে ছুটে আসে জুতের ঘরের পৈঠেতে। গর্জাতে শুরু করে নিবারণ—"শূয়রের ছাও শূয়র; তোরে খুনই কইর‍্যা ফেলামু আইজ।"
ইতিমধ্যে ভাবগতিক দেখে ঘরের কপাটটা বন্ধ করে দিয়েছে কাপাসী। একেবারেই সাড়াশব্দ করে না। সহজ সরল মানুষ নিবারণ, রাগলে আর জ্ঞানকাণ্ড থাকে না। খুব ভালভাবেই তা জানে কাপাসী।

অবশেষে রাত্রে শুয়ে শুয়ে মিটমাট হয়ে গেল সব কিছু। নিবারণের সোহাগে সোহাগে কাপাসীরও মনটা বিবশ হয়ে যায়। বুকের কাছে ঘন হয়ে আসে আর একটু। গরম নিঃশ্বাস পড়ে নিবারণের বুকে।
নিবারণ বলে—"অমন পাগলামি করস ক্যান বউ?"
"কি জানি, আমি আইজকাইল যেন কি হইয়া গেচি।" একটু থেমে কাপাসী বলে আবার—"আর করুম না এমন, কোন সময়ে না।"
অনেকদিন পর নিবিড় আলিঙ্গনে কাপাসীকে জড়িয়ে নেয় নিবারণ—"এইবার ঘুমা বউ, তিনপহর রাইত পার হইয়া গেচে অনেকক্ষণ।"

আট

জীবনে আবার অরুচি ধরে গেছে অনন্তহরির। রসময়ী তার জীবনটা বাতিল করে দিতেই এসেছে। অনেকদিন পরে আবার কুমার পাড়ার পথটা ধরলেন অনন্তহরি।

সিকিমালি সাহা পাড়ায় যাচ্ছিল, ডিঙি বেয়ে ; অনন্তহরি তাকে থামিয়ে পাটাতনে উঠে বসলেন। বলেন, "আমারে কুমার পাডায় নামাইয়া দিস্ এট্টু।"

"আইচ্ছা।"

ডিঙির ওপর বসে অনন্তহরি ভাবতে থাকেন কত কি? মনসা পূজার দিন তো কপিলা যৌবনের আগুন নিয়ে এসেছিল লেলিহ। সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে, ঘন সন্ধ্যায় কামনাঝলসিত চোখ দুটো যেন তার জলছিল ধক ধক করে। সে দিন কি যেন হয়েছিল তাঁর—মনটা শুচিশুভ্র হয়ে গিয়েছিল আচমকা—আর ভারি নোংরা মনে হয়েছিল কপিলাকে। মনে হয়েছিল অত্যন্ত অনায, অতিরিক্ত আদিম। কিন্তু তার চেয়ে বড় সত্যি আজ আবিষ্কাব কবেছেন অনন্তহবি। মনের সব কিছুকে মাখামাখি করেই শুধু ঐ মনসা পূজার দিনটা নেই—আছে বসময়ীর সঙ্গে অনেক গুলো বিস্বাদ দিনরাত্রির ইতিহাস।

কপিলার ধারালো যৌবনের হাল দিয়ে কি এই নিষ্ফলা ইতিহাসেব জমিনটা উর্বর করা যাবে না! তাঁর হৃৎপিণ্ডটা ধক ধক করে লাফাতে থাকে। ত্রিশ বছরের অনাবাদী জীবনে কি ফুলমুকুলের আশ্বাস আসবে না কপিলার সাহচর্যে? আর ভাবতেই পারেন না অনন্তহরি।

কুমার পাড়ায় নামিয়ে দিয়ে সিকিমালি ডিঙির গলুই ঘোরায় সাহা পাড়ার দিকে। অনন্তহরি এসে উঠলেন নিবারণের দাওয়ায়।

নিবারণ নেই, গিয়েছে চরজলমার হাটে গাওয়াল-বেসাতি করতে। কাপাসীও যেন এদিক সেদিক কোথায় রয়েছে।

অনন্তহরি তালাস করে এসে উঠলেন পাকেব ঘবের পৈঠেতে। কপিলা দো-আথায় মেটে হাঁড়ি চড়িয়েছে, আব মুখে গুঁজে দিয়েছে মোটা মোটা আমকাঠেব চলা।

একটা কাঁঠাল-কাঠের পিঁড়িতে জাঁকিয়ে বসলেন। তাবপব এটা সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করেন খানিক, অবশেষে বলতে থাকেন অনন্তহরি —"কি পাক করবি সুন্দরী ?"

"একটা বুড়া ছাগলের মাথা দিয়ে পাতরি।"

কপিলা ঝিলকিয়ে হাসে। অনন্তহরি গায়ে মাখেন না কথাটা, আল-গোছে বলেন—"মাংস বুঝি; খাসী কাটছে না কি নিবাবণ ?"

"দাদায় কাটে নাই, আমি কাটুম এই খুন্তি দিয়া।"

কপিলা পাশ থেকে খুন্তিটা তুলে উঁচিয়ে ধবে।

ভ্যাবাচ্যাকা মেবে যান অনন্তহবি। বলে কি মেয়েটা, খুন্তি দিয়ে খাসী পোঁচাবে, এ কেমন ধাবা কথা!

পিঁড়িটা সবিয়ে একটা নিবাপদ ব্যবধান বেখে বসলেন অনন্তহবি। ভাবগতিক বিশেষ সুবিধাব নয় কপিলাব, যুবতী মেযেব কিছুই নির্বিঘ্ন নয়। কিছুই নির্বিপদ নয়।

সহসা উঠে গিয়ে খুঁজেপেতে একছিলিম তামাক নিয়ে আসেন অনন্তহবি। বলেন—"এক হাতা আগুন দে সুন্দবী, মুখে আগুন দিমু।"

কপিলা খিক খিক কবে হেসে ওঠে—"হয়, হয় সেই বয়স তো হইচে,

এক হাতা আগুনে কি হইব। আস্তা একটা আমগাছ লাগব; পাটশোলা লাগব একতুর।"

চমকে ওঠেন অনন্তহরি। মুখের ছিরি দেখেছ মেয়েটার। মনটা দমে যায় আচমকা।

তবুও সহজ হয়ে অনন্তহরি বলেন—"দে, দে এট্টু আগুন দে, তামুকটা খাইয়া লই জুতমত।"

কপিলা এক হাতা আগুন এগিয়ে দেয় সুমুখে।

অনন্তহরি আবারও বলেন—"কি কি পাক করলি সুন্দরী, মনটা খোলসা কইর‍্যা ক' দেখি।"

কপিলা হাসে, বলে—"ক্যান, খাইবেন না কি চারডি আমাগো ঘরে।"

"হেঁ-হেঁ, আমি বামন মানুষ—" অনন্তহরি তো-তো করেন।

"বামন তো, বামনের মাইয়ার দিকে নজর ফেলাইলেই পারতেন, কুমারের ঘরে টান ক্যান ?"

"তোর লগে আর কারো তুলনা !"

অনন্তহরি হাত কচলান, কাঁচা-পাকা চুলের টেড়িটা পাট করেন হাত দিয়ে চেপে চেপে।

"তবে আমার হাতে খাইলে দোষের কি হয় !"

কপিলা তরলায়ত চোখে তাকায় ঘন ঘন।

অনন্তহরি মাথা ঝাঁকান—"না দোষের কি ? তবে—"

একটা আমতা-আমতার বেড়ায় বার বার হোঁচট লাগে তাঁর।

কপিলা হাসিতে শাণ দেয় আবার—"দোষের যখন না-ই তখন না হয় খাইলেনই আমাগো ঘরে চারডি ভাত। আপনেব বউর থিকা খারাপ পাক করি না মাছের বেগুন।"

ভারি ফ্যাসাদে জড়িয়ে প'ড়েছেন অনন্তহরি, এমনি এমনি পার পাবার

উপায় নেই। যেটা সহজ নাগালের মধ্যে মনে হয়েছিল—তার জন্য দাম দিতে হবে একরাশ। এতটা কি জানতেন অনন্তহরি?

অনেকটা এগিয়েছেন—এখন পেছন হটাটা ভারি বেমানান দেখাবে। দেখাই যাক না কতখানি ঘোলা হয় জল?

অনন্তহরি ধীরে ধীরে বলেন— "বামন মানুষ, কেউ দেইখ্যা ফেলায় যদি!" কপিলা মবলগ জবাব দেয়—"দেখুক; আপনেই তো কইচেন আমার তুলনা আপনের ত'বিলে (তহবিলে) নাই, তবে আব দোষেব কি?"

"উঁহু—সে কথা কই না। গেবামেব মানুষগুলাবে চিনস তো, জিভ্যায় সব বিষ! কত কি কথা উঠব এই লইয়্যা, যজমানীই হয়ত যাইব বন্ধ হইয়্যা।"

অনন্তহবি ইতি-উতি তাকান। একটু যেন ভয়-ডব কবে। কপিলাকে ঠিক ভবসা কবে উঠতে পাবেন না। মনটা কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

কপিলা খানিকটা এগিয়ে আসে, একেবাবে প্রশ্বাসেব নাগালে, বলে— "আমি বেশী, না আপনেব যজমানী বেশী? মনটা ঝোঁকে কোন মুখী?"

"তুই-ই আমার কাছে বড বসবতী, সব্বাইব থিকা। তোব জন্য সব করতে পারি আমি।"

অনন্তহরি বিচলিত হয়ে পড়েন, অন্যমনা হয়ে যান যেন।

"আমিই যদি বড, তবে আমাব কথা বাখতে হইব। খাইবেন আমাগো ঘরে।"

কপিলা ভুরু নাচায়, বুক উচোয়, উরু ঝাকায় আব অনন্তহবিব মন নাচে সঙ্গে সঙ্গে। ধীরে ধীরে বলেন—"আইচ্ছা সুন্দবী, দিনমানে কিন্তুক না, বাইতে আইস্যা খামু।"

কপিলা মাথা হেলিয়ে বলে—"আইচ্ছা।"

অনন্তহরি উঠে পড়লেন—চলে এলেন একেবারে খালের ধারে। আপাতত বাড়ী যাবেন।

জামরুল গাছটার ওপিঠ থেকে বেরিয়ে এল তুফানী ; সাঁতার কাটতে কাটতে একেবারে চলে এসেছে কপিলাদের উঠানে। সুমুখে এগিয়ে এসে বলে—"কি লো সই, শেষে এই বুড়া নাগর গলায় গাঁথলি।"

কপিলা বলে—"তোর বুঝি পরাণ উথলপাথল করে।"

"করে তো ; ভাগ দিবি নাকি এক থাবল।"

"উহু, তা হইলে আমি মইরাই যামু।"

কপিলা ঝুমঝুমিয়ে হেসে ওঠে।

"আমার উপায় ?" তুফানী গালে হাত রাখে।

"খালি কান্দন। যতই কান্দ, আমার চুল পাকা বুড়া নাগব দিমু না, কিছুতে না।"

"তবে যাই গিয়া সই, তুই ভারি নিঠুর।"

মুখটা মেঘকালো করে রাখে একমুহূর্ত, তার পরেই হাসির বিদ্যুৎ ঝিলিক মারে—"বুড়া কয় কি, রসের কথা বুঝি ?"

"হ, দেখ্ না সই কেমুন বান্দর নাচাই—ঐ যে"—তারপরেই কপিলা ছড়া কাটতে থাকে—

"আগন মাসে ধান তুলিবে ফাগন মাসে বিয়া
বুধু নাচ কর—
হাটের বাজালি মাছ, বাড়ীর বাইগন
তাই খাইয়্যা বুধুর আমার নাচন কোন্দন
বুধু নাচ কব—"

দুই সই হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ে এ ওর গায়ে।

তুফানী বলে—"নিতাইরে আইজ কাইল দেখি না যে হিজলতলীর খালে!"

"দেখ্ গিয়া কোন পেত্নীর লগে মালা বদল করচে বুঝি। তাই ফুরসুত পায় না এদিকে আসনের।" কপিলা বলে শানানো স্বরের ফুলকি ছিটিয়ে ছিটিয়ে।

"রঙ্গিলা নায়ের মাঝি আর আইছিল?"

"না।"

গলাটা থমথম করতে থাকে কপিলার। অভিমানের মেঘে ছলছল হয়ে উঠেছে চোখমুখ। সত্যি অনেকগুলো দিন গেল, তবু গোলক আসে না। আসলে আর কথাই বলবে না, 'রঙ্গিলা নায়ের' মাঝি তো সেদিন 'নিগুণ কথা' বলে যায় নি।

"ক্যান?" তুফানীর কৌতূহলটা প্রশ্নবোধক।

"জানি না।" কপিলার চোখে জল টলমল করে।

"অভিমান হইচে।" তুফানী এগিয়ে আসে আরো খানিকটা।

কপিলা জবাব দেয় না।

আবারও তুফানী বলে ওঠে—"আসব, আসব। হয়ত অসুখ বিসুখ করছে। বাউল মানুষ, নয়ত কোন মুখী বাইর হইয়া গেচে।"

তাই তো! এই দিকটা তলিয়ে ঘুলিয়ে দেখে নি। অসুখবিসুখ নিয়েই তো গোলক গিয়েছিল এখান থেকে—জ্বর ছিল গা-ভরা।

কপিলা অন্য কথার সীমানায় চলে আসে—"সন্ধ্যার সময় আসিস লো সই।"

তুফানী ঘাড় বাঁকায়, কোমর হেলিয়ে, চোখ উঁচিয়ে বলে—"ক্যান লো সই!"

কপিলা বলে—"ঐ যে কইলাম বুড়া বান্দব নাচামু।"
তুফানী রঙ্গের ঝিলিক তোলে—"বুড়ার যে কোমরে বাত।"
"একফির নাচলে বাত যাইব গিয়া।"
আচমকা তুফানী এগিয়ে গেল মোথরা গাছগুলোর দিকে। ওখান থেকেই বলে—"যাই লো সই; পোলাটায় যেন কান্দে মনে হয়।"
কপিলা হাসিতে তুফান তোলে, বলে—"আমার কিন্তু অন্য কথা মনে হয়।"
"কি?" তুফানী চোখ ফিরায় পিছন দিকে।
"হাইলা চাষায় কান্দে।"
একদণ্ড আর দাঁড়ায় না কপিলা, তাড়াতাড়ি এসে পাকের ঘরের আবডালে চলে যায়।
তুফানী এক ঝলক মোলায়েম হাসি ছড়িয়ে খালে গিয়ে নামে। মধুর হাসি। অপরূপ খুশির হাসি, মোথরা ঝোপগুলোর পাশ থেকে একটা গলা ভেসে আসে; ভারি মিষ্টি একটা কোন্দলের গলা—"সব সময় তোর মস্করা, আইচ্ছা গোলক আসুক, দেখা যাইব তখন।"
পাকের ঘরের আবডাল থেকে খিলখিলিয়ে ওঠে কপিলা—"পোড়াব-মুখী।"

ঘোলা ঘোলা সন্ধ্যা নেমেছে অঝোরে।
কপিলা আখার আগুনে হাত-পা সেঁকছিল; তাতিয়ে নিচ্ছিল গা-গতর। সারাটা দিনমান জলবৃষ্টিতে ভিজে ভিজে মাটি ছেনেছে অবিশ্রাম। ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাত পায়ের কব্জিগুলো যেন আলগা হয়ে গিয়েছে। অবশ হয়েছে শিরাস্নায়ু।

পাকের ঘরের পিছনে ঘন মানকচুর জঙ্গল। সেখান থেকেই গলাটা ভেসে এল সহসা।

"সুন্দরী; ও সুন্দরী, কুপীটা ধর তো এট্টু।"

প্রথমটা চমকে উঠেছিল, তারপর মনের দিগন্তে থিতিয়ে গেল চমকটা। একটা বাঁকাচোরা হাসি ঠোঁটের ফাঁকে ফুটে বেরুল। ও সেই বুড়া ভাগলটা!

কপিলা বলে—"আপনে ঠাকুরদাদু মানকচুর জঙ্গলে! জল সাঁতরাইয়া আসছিলেন না কি এই অন্ধকারে। দেইখ্যেন ঐ খানে আবার সাপ-খোপ আছে!"

একটা কান্না-ককানি শোনা যায়।

"শীগ্গির আয় সুন্দরী; পায়ে কাটা ফুটছে।"

কপিলা কাপড়চোপড় গোছগাছ করে বাইরে বেরিয়ে আসে। আহা শত হলেও বুড়ো মানুষ। এতক্ষণ খালি মস্করাই করেছে। আপসোসের একটা কাঁটার ঘায়ে পরাণটা খচ খচ করে ওঠে।

বলে—"কই ঠাকুরদাদু?"

"এই তো আমলকী গাছটার নীচে!"

কপিলা কুপীটা নিয়ে এগিয়ে আসে আমলকী গাছটার সামনাসামনি। আচমকা একটা ফুঁ দিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিলেন অনন্তহরি। থতমত খেয়ে গেল কপিলা।

বলে—"কুপীটা নিভাইয়া দিলেন যে ঠাকুরদাদু!"

"কুপী দিয়া কি হইব; তুই তো আছস, জ্যোচ্ছনা (জ্যোৎস্না) হইয়া গেচে চাইরদিক।"

কপিলা আবারও বলে—"আপনের পায়ে না কাটা ফুটচে!"

"হ, রসবতী ফুটছে; পায়ে না মনে; আর সুন্দরী তুই-ই সেই কাটা।"

একটা ক্ষ্যাপা আবেগে থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে অনন্তহরির গলাটা।

কপিলা হাসে শনশনিয়ে, বলে—"তাই না কি ঠাকুরদাদু।"

"হয়, হয়, রসবতী। এতদিনেও বোঝস নাই?"

অনন্তহরি এগিয়ে এসে হাত দুটো চেপে ধরেন কপিলার। পলকপাতের মধ্যে এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নেয় কপিলা। তারপর একটা নিরাপদ ব্যবধান রেখে সরে দাঁড়ায়। তারও পর খিল খিল শব্দ করে হেসে ওঠে; "ঠাকুরদাদু বয়স হইল কত?"

"রসময়ীর কাছে গেলে মনে হয় মইর‍্যা আমি ভূত হইয়্যা গেচি। আর তোর কাছে আইলে মনে হয়, আবার যৈবনকাল ফির‍্যা পাইচি। হে-হে—বুঝলি কী না রসবতী! উপুরের বয়সটা কী আর বয়স! মনে আমার রঙ আছে। পরাণে যৈবন আছে; তাজা যৈবন। আমার কথার মধ্যে সেই যৈবনের বাস পাইস না! সত্য কথাটা ক' দেখি কপিলা!"

"বাস আবার পাই না। গন্ধে পরাণ-মন আলুথালু হইয়া যায়।" বলতে বলতেই সেই খিল খিল হাসিতে শান দিতে থাকে কপিলা।

কুটিল সন্দেহে চেতনাটা ভরে গিয়েছে অনন্তহরির। ফিস ফিস গলায় তিনি বলেন; "তোর হাসিটা জানি কেমুন কেমুন!"

"কেমুন?"

"কইতে পারি না। তবে ঐ হাসি পরাণে বাজে।"

"বাজে বুঝি, তা হইলে আর অমুন হাসি হাসুম না। রাইত হইচে, এইবার যান ঠাকুরদাদু। বুড়া বয়সে ঠাকুরমা আপনেরে না দেখলে আবার ভিরমি খাইব।"

আর্তনাদ করে উঠলেন অনন্তহরি; "তোর কাছে আইলেই আমারে ভাগাইয়্যা দিতে চাইস। নামেই রসময়ী—তোর ঐ ঠাকুরমা মাগীর

যদি এতটুকু রস থাকত। পরাণে যদি এতটুক রঙ থাকত, তা হইলেও মনেরে বুঝ দিতে পারতাম। ঘরে একটুক সোয়াদ নাই; এতটুক শান্তি নাই। তাই ত মুইর‍্যা মুইর‍্যা তোর কাছে আসি রসবতী।"

দুপুরের দিকে কপাসীর জ্বর এসেছিল। সারাদিন কাঁথাকানির নীচে ককিয়েছে। ওর মেয়াদ মাঝরাত পর্যন্ত। সেদিক থেকে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত কপিলা। বললো; "আইচ্ছা ঠাকুরদাদু আপনে আমার কাছে আইস্যা কী সোয়াদ পান ক'ন দেখি?"

"ওই যে কইলাম, তোর কাছে আইলে যৈবনেরে ফির‍্যা পাই। তা ছাড়া পুরুষ মানুষ আর যুবতী মাইয়ার মনে মনে কুটুম্বিতা পাতান থাকে।"

কিছু সময়ের বিরতি। একসময় আবার কপিলা বললো, "কী ঠাকুরদাদু, খাইবেন না কি আমাগো ঘরে?" কৌতুকে তার কণ্ঠ ঝিকমিক-করছে।

"জাত দিতে কইস রসবতী? তুই কুমার, আমি বামন!" কণ্ঠটা কেমন বিরস শোনালো অনন্তহরির।

"পুরুষ মানুষ আর যুবতী মাইয়ার জাত কি আলাদা ঠাকুরদাদু?"

"ঠিক—ঠিক—" উৎসাহিত হয়ে উঠলেন অনন্তহরি। বিচিত্র এক পুলকে সামনের দিকে একটা পা বাড়িয়ে দিলেন, "ঠিক কইছিস রসবতী, তোর লেইগ্যা জান-মান বেবাক দিতে পারি। জাত কোন কথা!"

"তাই নাকি?" কপিলার কণ্ঠে সেই ঝিকিমিকি কৌতুক এবার খরধার হয়ে ওঠে, "জাত দিতে চাইলেই তো নেওয়া যায় না ঠাকুরদাদু। জাত নিলে যে আবার দিতে হয়। আমার জাত যদি একবার যায়, ঘরে-বাইরে কোনখানে জায়গা পামু না।" কণ্ঠটা এবার আশ্চর্য গম্ভীর

শোনাচ্ছে কপিলার।· শোনাচ্ছে আশ্চর্য নির্মম। "এইবার বাড়ী যান ঠাকুরদাদু। আপনার কাপড় ভিজা। অসুখ বিসুখ করতে পারে।" চমকে একবার কপিলার মুখের দিকে তাকালেন অনন্তহরি। আবছা অন্ধকারে সে মুখে কোন প্রশ্রয়ই লিখিত নেই।

"তবে যাই লো রসবতী; তুই যখন কইস। আমারে কিন্তুক ভুলিস না। আবার তোর কাছে আসুম।"

একটা বুনো আকুতি-ভরা গলায় বলতে থাকেন অনন্তহরি ভট্টাচার্য— সাতচল্লিশ ঘর কাহার-কুমার, তাঁতি-সদ্‌গোপের একচেটিয়া যজমানী ব্রাহ্মণ।

"আপনেরে কি ভুলতে পারি ঠাকুরদাদু? আপনেরে মনের মধ্যে গাইথ্যা রাখচি; একেবারে বউন্যা ফুলের মালার লাখান।"

একটা কুটিল সন্দেহ-ভরা দৃষ্টি ছড়িয়ে অনন্তহরি বেরিয়ে গেলেন খালের দিকে। আর কপিলা উন্মত্ত একটা হাসির ভঙ্গিমায় ভেঙে পড়তে লাগলো।

আগন মাসে ধান উঠিবে ফাগুন মাসে বিয়া
বুধু নাচ কর—
হাটের বাজালি মাছ, বাড়ীর বাইগন,
তাই খাইয়া বুধুর আমার নাচন কোন্দন
বুধু নাচ কর—

বুড়ো 'বান্দরে'র কোমরে একটা রসরঙ্গের কাছিই বেঁধেছে কপিলা। 'নাচনকোন্দন' শুরু হয়েছে তার অবিরাম, অবিশ্রাম, উদয়াস্ত।

নয়

অগ্রান মাস।

সারাটা আকাশ-ভরা উজ্জ্বল সূর্যের আশ্বাস। ঝকঝকে কাঁচা রোদ এসে ঝলকায় ঢেউখেলানো টিনের চালে চালে। পূব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের ভিটিতে পাকাপোক্ত সাতাশের বন্দের সব ঘর, শালতক্তার পাটাতন করে একটা কায়েমী ব্যবস্থা করে রেখেছে শ্রীধর মণ্ডল।

ঢালা উঠানে কাঁচা সোনার মত ধান শুকাচ্ছে।

পশ্চিমের ভিটিব দাওয়ায় হাঁটুদুটোর মধ্যে থুতনিটা ডুবিয়ে শ্রীধব বসেছিল চুপচাপ। মনটা ভারি অগোছাল হয়ে আছে ক'টা দিন ধরে। ঘুম-সোয়াস্তি কিছুই নেই। ভাবি অরুচি ধরে গেছে পৃথিবীটাব ওপব। বিস্বাদ হয়ে গেছে এই জীবন।

সেদিন সাজনগঞ্জে কুটুমবাড়ী গিয়েছিল শ্রীধব।

খালের ছায়াছন্দিত ঘাটে চোখাচোখি হয়ে গিয়েছিল এক কেশবতী কইন্যা'র সঙ্গে। সেই থেকে সুখঘুমের আবেশ নেই মনের কিনারে। পরাণটা আকুলিবিকুলি করে—বার বার ভাবনার চক্ররেখা থেকে 'কইন্যা'র চোখদুটো ভেসে উঠতে থাকে।

ইতিমধ্যে বার পাঁচেক রাঙা চেলি পরেছে শ্রীধর, পঁয়ত্রিশ পাক ঘুরেছে এই সত্তরটা হিসাবী বছরের জীবনে। বৌ এসেছে সোয়া এক গণ্ডা—চরজলমা, ইনামগঞ্জ, আউশখালি আর আবদুলাপুর থেকে। শেষ বউ মিলনী—এই সেই দিন বিইয়েছে।

বাড়ী-ঘর-ভরা লোকজন। নাতি-পুতির শিকড়ে-বাকড়ে জড়ানো

এ ভিটে, সে ভিটে। দু' বেলায় দেড়শ' খানা পাত পড়ে পাকের ঘরের টানা বারান্দায়।

ছেলে-পিলেগুলো কিচির-মিচির শুরু করেছে উঠানের কিনারায়। অন্যদিন হ'লে ধমক টমক দিত শ্রীধর কিন্তু আজ যেন ওসবে বিশেষ উৎসাহ পাচ্ছে না। আবারও হিজলতলীর সেই খালটা মনের পটভূমিতে রঙ ছড়াতে থাকে। টানা টানা চোখ, পুরন্ত গাল আর উদ্ধত বুকের অপূর্ব পরিপূর্ণতা—বিজুরী চমকের মতো শ্রীধরের চেতনায় ভেঙে ভেঙে পড়ছিল বার বার। সঙ্গে ছিল কান্ত, দিন-কৃষাণ খাটে শ্রীধরের জমিনে।

জিজ্ঞাসা করেছিল শ্রীধর—"মাইয়াটা কে রে ?"

"আইজ্ঞা কত্তা, নিবারণ পালের মামাতো বইন কপিলা।"

কান্ত জবাব দিয়েছিল ঠোঁট দুটো চাটতে চাটতে।

কপিলার নামটা, তার সুঠাম বরতনু একটা বুক ভাঙানো দীর্ঘশ্বাসের মতই হু হু করে বেরিয়ে এ'ল শ্রীধরের বুকটা উথলপাথল করে। কোন কিছুতে আজকাল মনরুচি নেই শ্রীধরের। এক-আধবার বিয়ালেই বউগুলো অকর্মা হয়ে যায়, গড়ন-পিটনে ধারতেজ কিছুই থাকে না। যৌবন হেজে যায়। মনটা একটা অজানা আগুনের আঁচে ধোঁয়াতে থাকে। মোটা গোঁফদুটো পাকাতে পাকাতে হাঁক দেয় শ্রীধর —"নিতাই অ নিতাই।"

"যাই কত্তা।"

কাছে-পিঠে কোথা থেকে যেন নিতাই এগিয়ে এ'ল সুমুখে।

"তামুক ভইর‍্যা দে এট্টু।"

নিতাই কল্কি সাজিয়ে হুঁকোর চূড়ায় বসিয়ে দিয়ে গেল।

শ্রীধর আলগা আলগা টান দিতে থাকে ফরসিতে।

আট পৌরে বৌ রয়েছে সোয়া একগণ্ডা। এখন প্রয়োজন একটা পোশাকী বৌ'র। নিপাট ভাঁজ করে মনের সিন্দুকে ফেলে রাখবার মত আহ্লাদী।

সারাটা দিনমান জমিজমার তদ্বিরতদারক করতে চলে যায়। সন্ধ্যার সময় ফরসি সুমুখে রেখে জঙ্গল-গোঁফে আতর মেখে বসলে আবছা আলো কুয়াশায় চোখের তারায় স্বপ্ন ঘনিয়ে আসে। কিন্তু এখন এই দিনের উজ্জ্বল রোদের মধ্যেই স্বপ্ন ভরে এ'ল শ্রীধরের পাকা ভুরুর তলা দিয়ে মদির চোখের পাতায়।

কপিলা! আরও বার দুই নামটা জড়িয়ে জড়িয়ে উচ্চারণ করল দু'শ কাণি দো ফসলা জমিনের মালিক রাঙামিলার শ্রীধর মণ্ডল।

আবারও হাঁক দিল শ্রীধর—"পণ্ডিত, অ পণ্ডিত।"

একজন আধ-বয়সী লোক এসে সুমুখে দাড়াল, বলে "ডাকছেন বাবা।"

হুঁ—বস, এট্টু কামের কথা আছে।"

পণ্ডিত নক্সাকাটা শীতল-পাটিখানার এক কিনারে উঠে বসল, বলে, "কি কইবেন?"

"মাজার ব্যথাটা আবার বাড়ছে আমার—সেই বাতের বেদনাটা—"

পণ্ডিত ব্যস্তসমস্ত হয়ে ওঠে—"কবিরাজ না হেকিম?"

"উহু—ওতে কুলাইব না।

"তবে হোমিপ্যাথ?"

থুত্নিতে হাত বুলাতে বুলাতে পণ্ডিত ভুরু কোঁচকায়।

"না-না, ঐ মিঠা ওষুধে বাঘা রোগ সারব না।"

পণ্ডিতের কপালে কতকগুলো রেখা হিজিবিজির মত ফুটে ওঠে; বলে —"তবে তবে। এ্যালুপাথি, রূপসাতলার বন্দরে একজন ভাল ডাক্তার আইছে।"

"না-না, ও তো ইংলিশন দিয়া মাইর‍্যা থুইব—"

"তবে—তবে—"

খুত্‌নি কচলাতে কচলাতে হাঁপিয়ে ঘামিয়ে একাকার হয়ে যায় পতিত। অবশেষে খানিকটা জিরান নিয়ে শ্রীধর মণ্ডল বলে ওঠে—"একটা মাইয়া দেখ, এই শ্যাষ বয়সে এট্টু খেজমত্‌ করব। রাতের ব্যথাটা আবার চাগাইয়া উঠচে।"

"কার লেইগ্যা—জীবন না পরাণের লেইগ্যা? দুইজনেরই তো বিয়ার বয়স ডাক দিয়া উঠচে।' পতিত খানিকটা হাল্‌কা হিসাব কষে বলে—"জীবনের এই বিশ গিয়া একুশ হইল, আর পরাণের আঠারো গিয়া উনিশ।"

জীবন আর পরাণ, রাঙামিলার দু'শ' কাণি দোফসলা জমিনের মালিক শ্রীধর মণ্ডলের মেঝ বৌর দুই ছেলে।

"আগে তো দেখ। তারপর দেখা যাউক কার লগে বিয়া হয়।"

প্রথমে একটু আধটু দমে যায় শ্রীধর। বড় ছেলের মুখোমুখি বলতে লাজশরমে বাধো-বাধো ঠেকে, একটু ইতি উতি করে থেমে যায় শেষমেশ।

পতিত বলে—"কান্ত খবর দিছে আউশখালির লক্ষ্মণ রাকুইর বইনটা বেশ ডাঙ্গর (সোমত্ত) হইছে, দেখুম তারে। দেখতেও না কি মন্দ না।"

"না-না আউশখালি না।"

ব্যস্তসমস্ত হয়ে ওঠে শ্রীধর।

"তবে চরজলমা।"

"উঁহু—ওখানে যাতায়াতে বড় ঝামেলা।"

শ্রীধর ভুরু কুঞ্চিত করে।

"তবে, ও—ও, মীরকাদিমের এক মাইয়ার খবর দিছিল হর্ষ।"

পতিত উপরের দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট চিবাতে থাকে।

"না, বড় জঙ্গলের ঘ্যাশ মীরকাদিম, কুটুম্বিতা সামলান যাইব না অতদূর থিকা।"

"আমরা তো আর রোজ যামু না মাইয়াব বাপের বাড়ী। মাইয়া তো থাকব এইখানে।"

শ্রীধর হাঁ-হাঁ করে ওঠে "তবুও তো যাইতে হইব, মুনের কুটুম্বিতার কম ল্যাঠা"!

"তবে— তবে।"

কপালের ওপব একরাশ ভাঁজ ফেলে এদিক-ওদিক করতে থাকে পতিত।

চারপাশে একবার সন্ধানী নজরটা তুলিয়ে নিল শ্রীধর। বলে—"সাজন-গঞ্জের দিকে এট্টু তালাস কর না!"

"সাজনগঞ্জ তো দূব কম না।"

"না, না—বেশী দূর আব কোথায়? সাত বাঁক জল ভাটাইয়া গেলেই তো সাজনগঞ্জ।"

"মীরকাদিম তো আবো সামনে—পাচটা খাল পার হইলেই এক দুপুরে যাওন যায়।" পতিত কথার কাটান দেয়।

শ্রীধর বলে—"না, না, সাজনগঞ্জেই দেখ—ঐ খানেই আমার ইচ্ছা—"

"ঐ খানে কোন মাইয়ার খোঁজ তো পাই নাই।"

"আছে, আছে, আমি জানি। যত শীগ্গিব পারস একটা ব্যবস্থা কব পতিত।"

"আইচ্ছা জীবনের বিয়া-ই আগে হউক বাবা।"

ঊর্ধনৃত্যের ভঙ্গিতে খানিকটা সুমুখে লাফিয়ে এ'ল দু'শ কানি দোফসলা জমিনেব মালিক রাঙামিলার শ্রীধর মণ্ডল। ধীরে ধীরে

সে বলতে থাকে—"বাতের ব্যথাটা আবার বাড়ছে পতিত; এই শেষ বয়সে আমারে খেজমত করনের লেইগ্যা—" গলাটা ফিসফিসিয়ে এসে অবশেষে মিলিয়ে যায় শ্রীধরের।

পতিত বলে—"হ, দেখুম তো মাইয়া, ঐ সাজনগঞ্জেই।"

শ্রীধর ধরা ধরা গলায় বলে ওঠে—"হয়, হয়, ঐ সাজনগঞ্জেই দেইখ্যো। নিবারণ পালের একটা বিয়ার যুগ্যি বইন আছে—"

"দু'টা মাইয়া দেখন দরকার, একলগে জীবন পরাণ দুইজনেরই চুইক্যা যাউক বিয়ার ল্যাঠা।" পতিত গম্ভীর গলায় বলে ওঠে।

অবশেষে শ্রীধর বলেই ফেলে মনের কথাটা; অনেক আকুলি বিকুলি, অসংখ্য লাজ-শরমের শিকড়জট খুলে মেলে—"জীবন পরাণের বিয়া থাউক আপাতত। আমার লেইগ্যা মাইয়া দেখ, ঐ সাজনগঞ্জের নিবারণ পালের বিয়ার যুগ্যি বইনটা—এই শেষ বয়সে এট্টু খেজমত করব—"

"আপনের লেইগ্যা মাইয়া!—" একটা প্রচণ্ড আর্তনাদ করে উঠে পড়ল পতিত। কোন দিকে একটী পলকও নজর না ফেলে হন হন করে এগিয়ে গেল ভিতরবাড়ী মুখো।

আর ফরসির গালে ঢিলে ঠোঁট রেখে হাল্‌কা হাল্‌কা টান দিতে থাকে শ্রীধর। ভাবতে থাকে কত কি! আকাশ পাতাল একাকার হয়ে আসে চেতনায়। সমস্ত ভাবনাটা নাগরদোলার মত বন বন করে ঘুরপাক খেতে থাকে।

কলপ-মাখানো চুল আর আতর মেশানো ভুর ভুরে গোঁফের ফুরফুরে সুবাসের সঞ্চয় নিয়ে কোন এক তন্দ্রারাঙানো সন্ধ্যা—পাশে এক তরল নয়না; হিজলতলীর খালে সে দেখে এসেছে সেই 'কেশবতী রাজ-কইন্যা'কে। তার কালো চুলের মেঘ মাতাল করেছে শ্রীধরকে; তরল

চোখের গরল মাখানো ঝিলিক বুকের শাঁসটা যে খাচ্ছে কুরে কুরে—সেই তরল নয়নার চোখে যে বহ্নি-কামনা তা কি শ্রীধরের—না, না, আর ভাবতেই পারে না। মাথার তালুতে চরের মত একটা টাকের নিশানা দেখা দিয়েছে আজ কয়েকটা বছর ধরে। ধীরে ধীরে তার বিস্তার হচ্ছে সারাটা মাথা জুড়ে—কয়েকগাছি হেজে-যাওয়া শণের মত চুলের ছাউনি ভারি বেমানান ঠেকে—কেশবতীর মন কি টলবে? একটা অজানা আতঙ্কে পট পট করে কয়েকগাছা চুল তুলেই ফেলল শ্রীধর মাথার চরটা থেকে। হাঁক দিল—"নিতাই—অ নিতাই—কান্ত, অ কান্ত—"

অবশেষে কান্তই সম্মুখে আসে।

"তামুকটা আবার সাজাইয়া দে তো কান্ত!"

কল্কি সাজিয়ে কান্ত চলে গেল বাইর বাড়ীর দিকে।

আর একটু পরেই পাঁচজন সতীন এ'ল চোখে-মুখে মেঘবৃষ্টি ঘনিয়ে। প্রথমবার ছাড়া সব-বারই এমনটি হয়েছে।

হিরণাই সব চেয়ে ছোট। এই সেই দিন প্রথম বিয়ান দিয়েছে। রাঙা চেলি পরে সাতটা পাক ঘোরার স্মৃতিটা তার মনেই সবচেয়ে বেশী তাজাতপ্ত—সিঁদুরের তেজও তারই বেশী। দুমাসের মেয়াটাকে কাঁখে করে নিয়ে এসেছিল। কেঁদে ককিয়ে এক শা করে ফেলে—"তোমার মনে এই আছিল, তবে বিয়া করছিল কেন আমারে?"

মেঝ বৌর চোখে অমন আল্‌গা ফোয়ারা নেই, ধারালো গলায় খনখনিয়ে ওঠে—"পাইছে, পাইছে, এই বুড়া বয়সে একটা পেত্নীতে পাইছে।"

তৃতীয় বৌটি ঠাণ্ডা, মনটা ভারি নরম, শরমও তারই একটু বেহিসাবী মাত্রায়। বিয়ের ফসল সে-ই তুলেছে সবচেয়ে বেশী -কোলে-কাঁখে,

বুকে-পিঠে সাত-সাতটা ছেলেমেয়ের ঐশ্বর্য তার। একদা তার গায়ের বাস না পেলে ঘুম-সোয়াস্তি কিছুই আসত না দু'শ কাণি দোফসলা জমির মালিক রাঙামিলার শ্রীধর মণ্ডলের।

সেও তেতেছে—তাতিয়েছে আর আর সতীনেরা; বুকের মধ্যে কথার তুষ জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে। এমন একটা ঐতিহাসিক মুহূর্তে সব জোট পাকিয়েছে। সে বলে—"কি দরকার আছিল আর একজনের; আমরা তো আছি পাঁচজন।"

শ্রীধর মণ্ডল মুখ তোলে—"কত কামের দরকার; এই ধানপাটের দিন আসতে আছে…"

"তার লেইগ্যা বিয়ার দরকার কি? তিনহালি গোমস্তা রাখলেই পার। আমরা না হয় গতর মেলুম আর একটু বেশী কইর‍্যা।"

মুখিয়ে ওঠে চতুর্থ জন। তারও কোল-কাঁখ ভরে দিয়েছে শ্রীধর।

"আমার লেইগ্যা বিয়া করি নাকি! তোগো খেজমত করব; থাকব তো একটা দাসী বান্দীর লাখান—কত মানুষেই তো এই বাড়ীর ভাত খায়।"

শ্রীধর অসহায় গলায় বলতে থাকে।

হিরণী ঝাঁকানি দেয় জিভে, তারপর কল কল করে ওঠে—"একটা দাসী বান্দী রাখলেই পারতা; সিন্দূর দিয়া একটা পেত্নী ধরনের কামটা আছিল কি?"

শ্রীধর কথা বলে না; শুধু ফরসির নলে টান দিতে থাকে তেজী তেজী। ওদের সব কিছু প্রতিরোধ তামাকের আগুনেই বুঝি ছারখার করে দেবে এমনি ভাবখানা।

অবশেষে মেঝ বৌ এর হাত ধরে, ওর কাঁধে ঝাঁকানি দেয়। বলে—"আইস্যা পড় তোরা, এই ড্যাকরা কি ক্ষ্যান্ত দিব বিয়ার নাচ না

নাইচ্যা। বুড়া বয়সে পেত্নী উঠছে ঘাড়ে—নিঃবইংশ্যা পোড়াকপাইল্যা, যমের অরুচি।"

সকলে চলে গেল, শুধু বড় বৌ আর একটু ঘনিয়ে এল শ্রীধরের কাছে। নিরীহ গলায় বলল—"ঠিক করছ করে বিয়ার দিন?"

এই একটা মাত্র নিশ্চিন্তের বন্দর শ্রীধরের এতবড় সংসারে। ভরসা রাখা যায় অপরিমেয়। হিরণীদের ঝড়ঝাপটা থেকে একান্তই নিরাপদ। ফরসিটা রেখে হাত দুটো ধরে বড় বৌর। বলে ওঠে একেবারে আকুল তরল গলায়—"বড় মনে লাগছে কপিলারে বড় বৌ—ওরে না পাইলে পরাণটা আমার বাতিলই হইয়া যাইব।"

"নিষেধটা করছে কে তোমারে। দিন ঠিক কইর‍্যা ফেলাও"

"ওরা যে কান্দন লাগাইছে—যদি বাইতদিন কপিলারে জ্বালায়?"

বড় বউ হেসে ওঠে—একটা স্নিগ্ধ মধুর হাসি, তার কপালের উজ্জ্বল সিঁদুর চিত্তিরটা ঝলমল করে ওঠে কুপীর আলোয়। ধীরে ধীরে বলে ওঠে—"ওরা পোলাপান মানুষ, অমুন এট্টু কয়ই। তার লেইগ্যা চিন্তার কি আছে? আমি ঠিক কইর‍্যা লমু সব, যাও মঙ্গলমত কামটা সার।"

ভরসা পায় শ্রীধর। দু'শ' কাণি দোফসলা জমির মালিকের ঠোঁটে একটা নিশ্চিন্তের হাসি ফুলকি ফোটায়। হ্যাঁ এখন একেবারেই নিশ্চিন্ত শ্রীধর।

দশ

পাকের ঘরে বসে বসে কপিলা ডালে সম্বরা দেওয়ার তদ্বিরে ছিল। একটা লঘুস্বাদ ঝিরঝিরে হাওয়া ভেসে আসছে বাঁশ-বেতসের ঝোপটা থেকে। কপিলার হাল্‌কা মনটা বাতাসের পাখ্‌নায় চেপে আচমকা উড়াল দিয়ে যায় বাসাইলের খালের দূর বাঁকে—কয়েকটা মাস আগের একটা উন্মত্ত অনুভব—

ও রঙ্গিলা নায়ের মাঝি
এই ঘাটে ভিড়াইওরে নাও
নিগুণ কথা কইয়া যাও
আমি পরাণ পাইত্যা শুনি।

রঙ্গিলা নায়ের মাঝি আর তো এ'ল না—তবে কি রঙ্গিলা নাও নোঙর ভেঙে আটকা পড়েছে কোন কেশবতীর বেনামী বন্দরে? কেশবতীর ঘন কালো এলো চুলের মেঘ কি গোলকের মনের আকাশ থেকে মুছে ফেলেছে কপিলার বিদ্যুৎ-অনুভবটা?

হিজলতলীর খালে, বউন্যা পাতার নরম নরম ছায়া ফেলা জলে গোলকের ময়রপঙ্খী কি কোন দিনই আর আসবে না? রঙ্গিলা নায়ের মাঝি তার নিগুণ কথা কি তবে অনামা অজানা কঙ্কাবতীর মনে মাখিয়ে দিয়েছে! না আর ভাবতেই পারে না কপিলা—মনের ভিতর দিয়ে একটা দমকা হাওয়ার ঝাপটা হু হু করে বেরিয়ে যায়। আল্‌গা হাতটা থেকে জলের পাতিলটা আচমকা পড়ে গেল চুলার মধ্যে। আবছা আবছা একটা সন্ধ্যার মেঘলা ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে।

অনেকদিন পর আবার ছিটেবেড়ার ফাঁকফোকরের মধ্য দিয়ে ডুটো ড্যাব ড্যাবা চোখ ঘুরপাক খেতে থাকে। বাগুইহাটির নিতাই কোষ নাও এনে ভিড়িয়েছে হিজলতলীর খালে।

"সুন্দরী, ও সুন্দরী—"

চমকে উঠেছিল কপিলা। বলে—"কে? গোলক দাদা?"

"না, আমি নিতাই।"

খিল খিল করে হেসে উঠল কপিলা। বলে—"ও, বান্দা, ত' এইখানে ক্যান তিনকড়ির কানা বইনটা·"

"না, না সালিনা—"

নিতাই করাতচেরা হাসিতে ঝিকিয়ে ওঠে।

আচমকা মিইয়ে যায় কপিলা, অসহায় গলায় বলে ওঠে—"কি কলি নিতাই?"

"কইলাম সালিনার কথা, কি সোন্দর একেবারে পৈরীর লাখান।"

সহসা কপিলা হাসির জলতরঙ্গ ছড়াতে থাকে। বলে—"মাছ খাউরা পেত্নীটার খিব সোন্দর।"

"তোর থিকাও সুন্দরী—"

একেবারে নিভে গেল কপিলা। জীবনে আজ প্রথম ছোবল মেরেছে নিতাই। কি বিষের জ্বালা ঐ একটা কথার দাঁতে। কপিলা একেবারে চুপচাপ—নিস্তব্ধ।

নিতাই আবারও বলে—"যাই লো বসবর্তী, চাই পাততে যমুপানকৌর বিলে।"

মানকচুর জঙ্গলে খচমচানি শোনা যায়। ভাবি ভাবি পায়ের আওয়াজটা মোথরা জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলেছে ক্রমাগত।

আচমক পাকের ঘরের এলাকাটি থেকে বেরিয়ে এল কপিলা। ডুবে

শাড়ীটা কোমরে জড়িয়ে ছুটল মোথরা জঙ্গলের দিকে। হাঁক দেয় ঘন ঘন—"নিতাই—অ নিতাই—"

ইতিমধ্যে নিতাই নৌকার পাটাতনে উঠে বৈঠা তুলে নিয়েছে হাতে। কপিলা কাউগাছটার শিকড়ে উঠে দাড়ায়। বলে—"যাস কই নিতাই?" গলাটা কেমন যেন ভিজে ভিজে, নেশা মাখানো।

জবাব ভেসে আসে একটা উত্তপ্ত গলার—"যামু আর কই? যাই সালিনার কাছে; কইন্যার গায়ের বাস, একেবারে "চাম্পা' ফুলের লাখান।"

কপিলার মনে উথল পাথলের একটা ঢেউ উন্মত্ত হয়ে উঠল। সেই রাত্রিটা—সুবল গাইছিল হাঁড়ির খোলে 'পইত্না'র আওয়াজ করতে করতে—

পুষ্করিণীর চাইর পারে ফুটল চাম্পা ফুল।
ছাইড্যা দেরে চ্যাংড়া বন্ধু ঝাইড়া বান্ধি চুল॥

সেদিন সুবলের গলায় শুধুই চাম্পা ফুল ফোটে নি, কপিলার মনেও ফুটেছিল থরে থরে, আর নিতাইর বাতাসে মন থেকে তার সুবাসটি উঠে ভুরভুর ছড়িয়ে পড়েছিল সারাটা দেহ ঘিরে। আজ সেই 'চাম্পা' ফুলের পরমায়ু কি একান্ত ভাবেই শেষ হয়েছে। না—না—

কপিলা ঘন গলায় বলে—"আয় নিতাই কামের কথা আছে একটা—"

শানানো কথার কলি ফুটেছে আজকাল নিতাইর ভোতা জিভে। বলে, —"সালিনা বইস্যা রইছে আমার লেইগ্যা বিকাল থিকা—যাই অন্য দিন আসুম—"

"না।" আকুল হযে উঠল কপিলা। কাউ গাছটা থেকে আরো খানিকটা নেমে এ'ল খালের কিনার ঘেঁষে। বলে—"না, সালিনা আইজ থাউক, আমার কথা রাখতেই হইব তোর আইজ নিতাই—আয় নাইম্যা।"

"কিন্তুক—তোরে বড ডডাই রসবতী, তোর জিভ্যায় যা আগুন। কথায় বুকটা পোড়ায়—"

"না আর তোরে খোচাইয়া কথা কমু না নিতাই। কোন দিনই না—"

কপিলা এগিয়ে এসে হাত দুটো ধরে নিতাইর। খানিকটা ইতি উতি ভেবে অবশেষে নেমেই এ'ল নিতাই। কপিলা জড়ানো গলায় বলে—

"তোরে আমি ভালবাসি নিতাই।"

কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। কপিলা নিতাইর বলিষ্ঠ বুকটায় মিশে এ'ল এক লহমায়। বন্য পৌরুষের ক্ষ্যাপা সমুদ্রে সেতুবন্ধন হ'ল উদ্দাম কুমারী যৌবনের। আপাতত রঙ্গিলা নাও কেশবতীর বন্দরেই আটকা থাকুক—

আগনমাসে ধান উঠিবে, ফাগন মাসে বিয়া

বুধু নাচ কর—

হাটের বাজালি মাছ বাড়ীর বাইগন

তাই খাইয়া বুধুর আমার নাচন-কোন্দন

বুধু নাচ কর—

বুধু অনেক নাচই নেচেছে এ কটা মাস—কপিলা রঙ্গের কাছি কোমরে পেঁচিয়ে অনেক ঘুরপাক খাইয়েছে অনন্তহরি ভট্টাচার্যকে। ধৈর্য অসীম, সহ্যের সীমানাটাও আসমান-সমান। পাকের ঘরের পাশ দিয়ে যখনতখন ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়—কপিলার ভাঙা ভুরু একটু যদি সোজা হয়—মনে মনে মানত করেন অনেক। কিন্তু বরাতে যখন ভাঙন এসেছে—তখন ভেঙেচুরে তছনছ হবেই সমস্ত কিছু। পরানটা একেবারে ছ্যাঁৎ করে উঠল।

কাউগাছটার ও-পিঠ থেকেই বেশ ঠাহরে আসে—দেখলেন অনন্তহরি, চোখ কচলে পুরোপুরি দৃষ্টি মেলেই দেখলেন কপিলা আর নিতাইকে।

বুকের ভিতরে কোথায় যেন এইমাত্র একটা ফাটল ধরেছে—একটা আহত অনুভব আছাড়ি পিছাড়ি খেয়ে ভেঙে-চুরে পড়তে থাকে ক্রমাগত। হ্যাঁ তিনি একান্তভাবেই অনধিকারী, নিতান্তই অবাঞ্ছিত—নিতাইদের। সীমানা তিনি পেরিয়ে এসেছেন আজ দু' দুটো যুগ। এই দুটো যুগ ভরে একটা নিষ্ফলা ইতিহাসের কান্না উঠেছে তাঁর জীবনে। পুড়ে যাক তাঁর বুক—এক ঝলক তরল নজর কেউ ছড়াবে না তাঁর জন্য।

থাক ওরা যেমনটি আছে—অনন্তহরি ধীরে ধীরে সরে গেলেন কাউগাছটার ওপিঠ থেকে।

কপিলার উন্মত্ত যৌবনের সমুদ্রে বাধক্যের ভাঙা বজরার জন্য কোন নিরাপদ বন্দরই নেই—সেখানে নিতাইদের ময়ূরপঙ্খীই এগিয়ে চলুক নির্বিবাদে।

কয়েকটা দিন পর তিনখানা দোমাল্লাই নৌকা এসে ভিড়ল হিজলতলীর খালে। একেবারে নিবারণ পালের ঘাটের লাগোয়া। দু'শ কাণি দোফসল। জমির মালিক রাঙামিলার শ্রীধর মণ্ডল এসেছে মেয়ে বায়না করতে। নিবারণ চাকের ঘরে পাটি বিছিয়ে দিল এ মাথা থেকে সে মাথা পযন্ত। হর্ষ-কান্ত-রসময়রা বসল জাঁকিয়ে। এ বাড়ী সে বাড়ী থেকে ডাবা হুঁকো এ'ল গোটা সাতেক। মতিহারী তামাক জ্বলতে লাগল কল্কির চিতায়।

শ্রীধর সারা মাথায় কলপের একটা পুরু প্রলেপ চাপিয়েছে—ইচ্ছেমত আতর ছড়িয়েছে মোটা মোটা গোঁফ দুটোয়। দিন-কয়েক আগে গঞ্জ থেকে এসেন্স এনেছে এক ডজন—একটা আস্ত শিশিই ঢেলেছে পিরহানটার ওপর। একটা মন্থর গন্ধে বাতাসটা উগ্র হয়ে উঠল।

কাপড়খানা গোছগাছ করে পরেছে পঁচিশ বছরের জোয়ানের মত, পিরহানটা তেইশ বছরের মতই রঙচঙে।

ঝোলা গাল দুটোয় এক খাবল কাঁচা বয়সের হাসি তুলবার বন্ধ্যা চেষ্টা করল রাঙামিলার শ্রীধর মণ্ডল। পাত্র হিসাবে কি এমন বেমানান—বয়সটাই যা একটা বেখাপ্পা পর্যায়ে এসে পড়েছে। এসেন্সের জটিল গন্ধে তালুর অবুঝ টাকের চাঁদো জমিনটা আর এক আঁটি বিচালির মত তামাটে তামাটে চুলের বিশ্বাসঘাতকতা কি ঢাকা পড়ে নি? এদিক সেদিক একবার সতর্ক নজরনিরীখ ফেলে বলে—"হেঁ-হেঁ আমিই পাত্তর।"

নিবারণ বলে—"আমার বরাতে—"

এ-ভিটি সে-ভিটি থেকে ছেলে-বুড়ো-জোয়ানের জমায়েত হয়েছে চাকের ঘরের চৌকাঠে। পেছন থেকে কে যেন খিক খিক করে হেসে ওঠে—"পাত্তরের বয়স বেশী না—ঐ কি, ঐ কি—বুকের চুলগুলা দেখি দুধের লাখান—"

তাই তো, তাই তো ভাবি আহাম্মুকি হয়ে গিয়েছে। উপরের বোতামটা কখন যেন খুলে গিয়েছিল, আর তার মধ্য দিয়ে কুটিল বুকটা বেরিয়ে এসেছিল এক ঝলক। ভারি বোকামি হয়েছে তো!

ত্রস্তে বোতামটা আটকে দিল। বুকেও যদি কলপ মেখে আসত!

নিবারণ ঘন ঘন তাড়া দেয়—"তোরা যা তো অখন, পরে আসিস।"

ভিড়ের চাকটা ভেঙেচুরে সকলে উঠানে গিয়ে নামে। নবীন পালের মেয়ে বাতাসী ছড়া কাটতে কাটতে চলে গেল জামরুলতলার পাশ দিয়ে।

বুড়া কালে শখ গজাইছে সাদির লো
আয় সখীরা জল আনিতে যাই—
বুড়ার চিতায় ঢালুম খালের জল লো
আয় সখীরা ফুল তুলিতে যাই—

বলে কি মেয়েটা? শ্রীধর কেমন যেন থতমত খেতে থাকে।

নিবারণ হাত কচলায়। যুবতী মেয়ের বাজার দর সম্বন্ধে সে অতিমাত্রায় সচেতন, একান্তভাবেই ওয়াকেবহাল। কপিলার মা-বাপ মরবার পর সাতটা বছর পেরিয়ে গিয়েছে—এই দীর্ঘায়ত সাতটা বছর ধরে তোয়াজ করে সে কপিলার যৌবন পুষে আসছে। এই এমনি একটা অর্থভরা মুহূর্তের জন্যেই। একটা মুহূর্তের জন্যও কাপাসীর ধারালো জিভ বসতে দেয় নি ওর মনের পাতে। বেহিসাবী কাপাসী একথা কি বুঝছিল কোন দিনও? মনে মনেই একটা ঝড়ো হাসির দমক তুলল নিধারণ। এতক্ষণ হাত কচলাচ্ছিল, এবার থুত্‌নি খাবলাতে থাকে; ধারালো নখগুলো দিয়ে! খানিকটা তো-তো করে—"হেঁ—হেঁ—"

শ্রীধর বলে—"টাকা পয়সা, দেওনথোওনের লেইগ্যা ভাববেন না—আমার কি টাকা পয়সার টান পড়ছে।—"

"তবে নয় কুড়ি টাকা মাইয়া পণ।"

নিবারণ ঘামিয়ে ওঠে।

ধান-বেচা গরম টাকা নরম খেয়ালের বাতাসে না হয় ক'খানা উড়িয়েই দিলে। ন' কুড়ি কোন কথা, শ' কুড়ি হ'লেও সে পেচ-পা হ'ত না। বিশ কুড়িই সে গুঁজে দিল নিবারণের মুঠিমে।

নিবারণ আবারও তো-তো করে—"হেঁ—হেঁ—"

বিশ কুড়ি টাকার একটা উন্মাদ অনুভব তার মুঠোয়, কুলকুল করে ঘাম বেরিয়ে আসে গা-পিঠ ভিজিয়ে। কাপাসীকে এবার বুঝিয়ে দেবে কপিলার ঠমক-ঠসকের দর-কদর কতখানি?

সহসা ব্যস্তসমস্ত হয়ে ওঠে নিবারণ; বলে—"তাই তো মাইয়া দেখেন এইবার।"

"না—না—মাইয়া আমার দেখা আছে।"

ধীরে ধীরে একটা নিশ্চিতের আভাস-ভরা গলায় বলে ওঠে দু'শ কাণি দোফসলা জমিনের মালিক রাঙামিলার শ্রীধর মণ্ডল !

"তবু—তবু—একবার সামনে বইস্যা—"

হাঁ—হাঁ—করে ওঠে নিবারণ।

"না—না—কাম নাই দাদা। আইজ উঠি; এই মাসের শেষেই একটা শুভদিন দেইখ্যা—"

"হয়—হয়, তা কি আর কইতে !"

একে একে সকলে উঠে পড়ে। কান্ত-হর্ষরা ইতিমধ্যে খালের ঘাটে এসে নৌকার পাটাতনে উঠেছে।

ছিটে বেড়াটার ফাঁক দিয়ে আবার দুটো ড্যাবড্যাবা চোখ ভেসে ওঠে। কপিলা দোআখার মুখে শুকনো পাতা গুঁজে দিচ্ছিল। খবরটা তাব কানেও এসেছে—এসেছে কয়েকটা দিন আগেই—শ্রীধর মণ্ডলের ঢালা ধান-শুকাবার উঠানটা পেরিয়ে, কঙ্কাবতীর খাল আর হিজলতলীর খালের তিরতিরিয়ে-চলা হালকা ঢেউএর মাথার ওপর দিয়ে ভেসে এসেছে একেবারে এই পাকের কুঠুরীতে।

জীবনেব প্রথম রাঙা চেলির আস্বাদটা ঘনিয়ে আসছে না কি খুবই তাড়াতাড়ি! বুকটা ঝলসে যায় সহসা; হু-হু করে দীর্ঘশ্বাসের একটা দমকা হাওয়া চেতনাটা চিরে চিরে বেরিয়ে যায়। বার্ধক্যের কাছি দিয়ে শেষ পর্যন্ত কি গলায় ফাঁস লাগাতে হবে !

ও রঙ্গিলা নায়ের মাঝি,
ওই ঘাটে ভিড়াইওরে নাও

নিগুণ কথা কইয়্যা যাও

আমি পরাণ পাইত্যা শুনি—

কই—রঙ্গিলা নায়ের মাঝি আজও তো এলো না। কেশবতীর বন্দর এখান থেকে কতদূর? পাল উড়িয়ে, গুন টেনে সেই বন্দরে পৌছতে পৌছতে জীবন কী ফুরিয়ে যাবে কপিলার? বিবশ হয়ে আসে চেতনা, অন্যমনা হয়ে যায় কপিলা।

"সুন্দরী—ও সুন্দরী।"

চমকে উঠল কপিলা। বলে—"অ—বান্দা।"

"আবার ছ্যাকা দিয়া কথা কইস রসবতী!" থমথম করতে থাকে নিতাইর গলাটা।

"ছ্যাকা দিয়া কথা কমু না তো সোহাগের আতর মাখাইয়া কথা কমু না কি রে বান্দা, তোর লগে।"

নিতাই কোন জবাব দেয় না। সহসা বলে ওঠে—"শেষে ঐ বুড়ার লগে! খালে জল আছিল না? আমারে কইলে একটা দড়ি পাকাইয়া দিতাম পোক্ত কইর‍্যা।"

"যা-যা বান্দা, তোরে তাই বইল্যা মার্দুলী বানাইয়া ঝুলামু নাকি গলায়? গলায় যদি দিমুই ফাঁস তবে শক্ত গাছেই দিমু; কচু গাছের লগে ক্যান রে বান্দা?"

কপিলা ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

নিতাইর পরাণটা ফালা-ফালা হয়ে যায় কথার ফলা লেগে। না আর সে কোনদিনই আসবে না কপিলার কাছাকাছি, কোন দিনই না!

কপিলা আবারও কলকলিয়ে ওঠে—"নাও যদি ভিড়াই তবে ভিড়ামু পোক্ত ঘাটেই। আঘাটে-কুঘাটে ক্যান রে বান্দা! যা-যা।"

নিতাই সহসা বলে ওঠে—"শেষতক একটা বুড়া বান্দরের লগে নাচবি সুন্দরী ?"

"নাচুমই তো, আমি ঐ থানে গিয়া রোজ তোরে দিয়া পায়ে তেল ডলামু সোয়া সের। যা—যা বান্দা—মনিব আবার খড়ম লইয়া—"

একমুহূর্তও দাঁড়ায় না নিতাই—হন হন করে এগিয়ে যায় মোথরা জঙ্গলটার দিকে।

কপিলা খিক খিক করে হেসে ওঠে ; তারপরই ভাবতে থাকে কেশবতীর বন্দর থেকে রঙ্গিলা নায়ের মাঝি তুলেছে কি নোঙর, টাঙিয়েছে কি পাল, হালে কি মোড় পড়ে নি এখনও ? কে জানে ?

এগার

দিকরাত্তির থেকে এয়োরা এক জোট হয়েছে। বারুইবাড়ী, কুমার বাড়ী উজাড় হয়ে এসেছে বউয়ারি-ঝিয়ারিরা। পঞ্চাশটা গলায় একটা গানের সুরই উদ্দাম হয়ে উঠল। সব যাবে 'জলসই' করতে। তার জন্যই বেদিশা মাতামাতি। আগামী কাল রাঙামিলার শ্রীধর মণ্ডলেব বিয়ে। সব গাইছে উল্লাসে খলবল করে-ওঠা গলায়—

আইজ রামের অধিবাস
কাইল রামের বিয়া গো কমলা
আমরা জলে যাই।

খানিকটা থেমে থেমে ঝাঁক পেড়ে পেড়ে দমক তুলছে সুর গমকেব। মিলনীর গলাটাই যেন সব চেয়ে চড়া। সে গাইছে খোলামেলা গলায, সকলের গলাকে ছাপিয়ে উঠছে তার ধারালো সুরের ঝলক। আবাবও সকলে এক হয়ে টান দিল—

শ্যামের ঘাটে বাঁশী বাজে গো কমলা
আমরা জলে যাই
কেহ পবে পৈছা খাড়ু, কেহ পরে শাড়ী,
রাধিকা সুন্দরী পরে গরদের শাড়ী গো কমলা
আমরা জলে যাই
আগে সখী, পাছে সখী জল ভরিতে যায়,
মইধ্যের সখীর নীলাম্বরী বাতাসে উডায় গো কমলা,
আমরা জলে যাই।

কাপড় নিল কালা চিকন, কলসী নিল সোতে গো কমলা।

আমরা জলে যাই।

গেছে গেছে কলসী গেছে, আরো দেব কলসী,

কলসীর কানায় লিখে দেব কলঙ্কিনীর নাম গো কমলা,

আমরা জলে যাই।

বাইর বাড়ীর ঘরে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল নিতাই। রাতভর ঘুম আসে নি একপলক চোখের পাতা ঘিরে। অঘ্রানের শেষাশেষি—বাতাসে শীতের মিষ্টি একটা আমেজ ছড়িয়ে রয়েছে, ছিটেবেড়ার ফাঁক-ফোকর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঝলকে ঝলকে।

মনের ভিতরটা হু হু করে পুড়তে থাকে। কপিলা—'মাইয়া লোক' না তো যেন কালশংখিনী; কলিজার উপর মিঠা কথার ফণা দিয়ে ছোবল দিতেই জানে শুধু। সে দিন পাকের ঘরের ওপাশে এই বুকেরই ওপর উষ্ণ স্পর্শ পেয়েছিল কপিলা। ধীরেধীরে বুকটা হাতাতে থাকে নিতাই। পোড়ানি থামে না, সেদিনের সেই উষ্ণ অনুভবের ঘষায় ঘষায় বেড়ে চলে হাজার গুণ। যার হাতের স্পর্শে এ জ্বালা মুছে ঠাণ্ডা চন্দনের মত জুড়াতে পারত মনটা, সে হাত তো কালই বাঁধা পড়বে শ্রীধরের সিঁদুরের শিকলে। পরাণটা হুতাশে মোচড়াতে থাকে।

শীতের আমেজমেশানো এক ঝলক অঘ্রানের বাতাসের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে ভেসে এ'ল গলাটা।

আইজ রামের অধিবাস

কাইল রামের বিয়া গো কমলা,

আমরা জলে যাই।

নিতাইর জীবনেও এমনি একটা অধিবাসের মরসুম এসেছিল বৈ কি! হলুদ-চন্দন মাখিয়ে তার মামী আর সোনারঙের এয়োরা তাকেও

সাজিয়েছিল। শ্রাবণ মাসের দিন সেটা! ভরা বর্ষা; শিয়রের জানালাটা দিয়ে জলতরঙ্গের মত মেঘনাব কুল কুলানি বাজনা ভেসে এসেছিল। মনেও যেন বাজনা বেজেছিল তার—সারা রাত ঘুমাতে পারে নি নিতাই। নিশিরাত্তির থেকেই ভরত মণ্ডলের বড় মেয়েটা 'জলসই'এর গান ধরেছিল এমনিই আকুল-তরল গলায়, স্বর ঝাঁকিয়ে, গলা টেনে—

আইজ রামের অধিবাস
কাইল রামের বিয়া গো কমলা
আমরা জলে যাই।

আজ আবার হঠাৎ সরলাকে বড় ভাল লাগল। লাল চেলি পরে নয়া তোশকের উপর বসেছিল পাশাপাশি—সেই উষ্ণ প্রথম বিয়ের রাত্তিরটা; বুকটা যেন চৌফালা হয়ে যায়। আব ভাবতেই পাবে না নিতাই।

সহসা বিষে-মধুতে মাখামাখি মনের চটকটা ভেঙে গেল এক লহমায়। মিলনী এসে ডাকাডাকি শুরু করে দেয়—"নিতাই দাদা—অ নিতাই দাদা। এমুন একটা দিন। গানেব ঝাঁকিতে পাড়াব মানুষ আইস্যা ভাইঙ্গ্যা পড়ল উঠানে, আর তোমার ঘুমই ভাঙ্গে না।"

"যাই বৌঠাইন।"

আরও খানিকটা জবুথবু হয়ে শুয়ে থাকে নিতাই। মনে জোব-জুত নেই একেবারেই।

টগবগ করে ওঠে মিলনী—"ওঠ, ওঠ, নিতাই দাদা! নাও লইয়া গাঙে যাইতে হইব!"

"ক্যান?"

নিতাইর গলাটা কেমন যেন ঢিলে-আল্‌গা। নিজের কানেই বেমানান ঠেকে।

"ভাল, সবই তোমার ভুল হইয়া গেল না কি? আইজ তোমাগো কত্তার জলসই না! ওঠ, ওঠ, সময় বইয়্যা যায় যে!"

চোখ কচলাতে কচলাতে ঝাঁপিটা খুলে বেরিয়ে এল নিতাই।

এয়োরা জলসইতে যাওয়ার যোগাড়-যন্ত্র করেছে। চিত্তির-করা কুলোয় কড়ির ঝাঁপি, পান, তেলধনে ঘটসরা সব গুছিয়ে নিয়েছে ইতিমধ্যেই। এয়ো যাবে প্রায় জন পঞ্চাশেক।

নিতাই, রায়েবালি আর কান্তকে নিয়ে খালের ঘাটে এ'ল। নৌকা খুলল তিনখানা—কুমার পাড়া, কাহার পাড়া এমনি নানান অঞ্চল থেকে সিঁদুর-সীমন্তিনীরা এসে উঠল নৌকায়। বরণ ডালাটা কাঁখে করে বড় বৌ বসল মধ্য খানে।

কঙ্কাবতীর খাল চিরে চিরে নৌকা তিনখানা এগিয়ে চলল—বাইছে নিতাই, বায়েবালি আর কান্ত। বড় বৌ বলে—"তোরা থামলি ক্যান? গাইতে শুরু কর।"

খালের ঢেউএর ওপর দিয়ে এক ঝাঁক গান-জড়ানো গলা উন্মত্ত হয়ে উঠল। সকলেই গলা ছেড়ে দিয়েছে :—

শ্যামেব ঘাটে বাশী বাজে গো কমলা
আমরা জলে যাই।
কেহ পবে পৈছাখাড়ু, কেহ পরে শাড়ী,
রাধিকা সুন্দবী পবে গরদের শাড়ী গো কমলা,
আমরা জলে যাই।

আজ থেকেই সকলের পান-সিঁদুর আর রাঙা ভাতের নিমন্ত্রণ হয়েছে বড় গৃহস্থের বাড়ী। একেবারে শুভরাত্রি অবধি কেউ আর বাড়ী গিয়ে আখায় আগুন ধরাবে না।

মেজ বৌ জল সইতে যায় নি। ঘরের ঝাঁপটা আর একটু জোর করে

টেনে পাত্‌লা কম্বলটা মুড়ি দিল আগা-মাথা; তারপর গন গন করে ওঠে—"পোড়াকপাইল্যা, ড্যাকরা, বুড়া বয়সে শরাদের (শ্রাদ্ধ) মন্ত্র পড়ব না বিয়ার লাচারী পড়তে যায়—নিঃবইংশ্যা; যমের অরুচি।"

নিবারণ মোচড়-মোড়ন দিয়ে রাঙামিলার শ্রীধর মণ্ডলের মনটা থেকে রস ঝরিয়েছে অনেকখানিই। বিশ কুড়ি টাকা কন্যাপণ—একি মুখের কথা!

বিয়ের আয়োজনটাও করেছে বেশ পরিপাটি; সকলের মুখেই সুখ্যাতি ছড়ানো। মামাতো বোনের জন্য কে এমনটা করে! আসলে দরকার কলিজার!

বাসী বিয়ের দিন কপাল-সিঁথি সিঁদুরে চিত্তির করে কপিলা কলাগাছের পাশ দিয়ে তিনটে পাক দিয়েছে সবে, এমনি সময় গোলকের নাও এসে ভিড়ল হিজলতলীর খালে। উঠানে পা দিতেই চোখাচোখি হ'ল।

কেন আজ এ'ল রঙ্গিলা নায়ের মাঝি? দুটো দিন আগে কি কেশবতীর বন্দর থেকে নাওটা ছাড়তে পারত না গোলক! টানা টানা চোখ দুটোয় শীতের শিশিরের মতই জল ঘণীভূত হয়ে ওঠে। টলমল করতে থাকে মনটা।

ও রঙ্গিলা নায়ের মাঝি
এই ঘাটে ভিড়াইওরে নাও
নিগুণ কথা কইয়া যাও
আমি পরাণ পাইত্যা শুনি।

রঙ্গিলা নায়ের মাঝির 'নিগুণ কথা' আর কোন দিনই শোনা হবে না। শাঁখা আর সিঁদুরের শক্তপোক্ত কাছিতে রাঙামিলার শ্রীধর বেঁধে ফেলেছে কপিলার দেহমন। থর থর করে ওঠে সারাটা দেহ—এখন

আব শিশিব নয়, ফোয়াবা নামল চোখেব কোলে। গোলক—এই কি ছিল তোমাব মনে! কেশবতীব কুহকে কি এতই গবল!

কোনবকমে সাতটা ঘুবপাক খেয়ে চিত্তিব-কবা পিঁড়িতে গিয়ে বসল শ্রীধব আব কপিলা। তুফানী কপিলাব কানে মুখটা ঠেকাল—"সই চোখে জল ক্যান?"

"কই না তো।"

কপিলা ত্রস্তে চেলি দিয়ে জলটা মুছে ফেলে।

"আমাব চোখেবে ফাকি দিতে চাস সই?"

"না—না বালি পড়ছিল বুঝি।"

"বালি না, আস্ত একটা মানুষ।"

চোখ ফেটে যেন জল বেবিয়ে এ'ল এক পশলা। মাথাটা তুফানীব কোলে গুঁজে দেয় কপিলা।

বলে—"সবই তো বোঝস সই। আমাব বুকাতে যে কি আছিল।"

"যা হওনেব তা তো হইয়াই গেছে। আইজকাব দিনে চোখেব জল ফালাস না সই, সাবাটা জীবন কিন্তুক এব দাগ থাকে।"

তুফানী ফিসফিসিয়ে ওঠে।

এক উঠান মানুষ একেবাবে হাঁ-হাঁ কবে ওঠে—"কি হইল, কি হইল কইন্যাব?"

তুফানী বলে—"কিছু না, সাবাটা দিন না খাওয়া, একেবাবে নিজ্জলা উপাস, তাই ভিবমি খাইছে এট্টু।"

খানিকটা এদিক সেদিক তাকিয়ে গোলক চাকেব ঘবেব ফবাশে এসে উঠল।

খালেব ঘাটে নৌকাব গলুইটাব ওপব ঠায় বসে আছে নিতাই, মনেব মধ্য দিয়ে একটা আগুনেব শিষ চলেছে লকলকিয়ে। না তাব

জীবনটাই বরবাদ হয়ে গেল বুঝি! আর একটা দণ্ডও থাকার ইচ্ছা নেই রাঙামিলায়। কোষ নাওখানা নিয়ে আবার সে পাড়ি জমাবে মেঘনার উন্মাদ ঢেউয়ের উপর দিয়ে অজানা অনামা নিরুদ্দেশের ঠিকানায়। পাঁচটা বছর আগের একটা কুটিল রাত্রি। আহত একটা মন নিয়ে সে নৌকার রশি খুলেছিল সেদিন সোনারঙ থেকে। আর কোনদিনই তার ডিঙির পালে সোনারঙের বাতাস লাগবে না। সেদিন ছিল সরলা; তারই শাঁখা-সিঁদুর বন্দিনী; আজ—আজ কপিলা। মনের শাঁখা সে অনেকদিন আগেই পরিয়েছে কপিলার সুডৌল মণি-বন্ধে। তবে—তবে—

একটা ঢেউ উঠল বুকের ভিতরটা ওলটপালট করে দিয়ে।

সালিনাও চলে গেছে চরজলমার বন্দরে। উঠেছে সারি সারি খাপরা ছাওয়া একটা ঘরে; যাওয়ার আগের দিন সালিনা বলেছিল—"না খাইয়া মরার থিকা আমার বেশ্যা হওন কি খারাপ?" সেদিন কেমন যেন লেগেছিল কথাটা। ঠিকমত মনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে নি। এখন বড় অসহায় লাগছে। নিতাই নজর ফেলে ইতি উতি।

সালিনাই তো তবু তাকে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল; কথার মৌ আর বুকের উম মিশিয়ে।

আচমকা চমকটা ভেঙে গেল। রায়েবালি এসেছে, বলে "কি নিতাই ভাই; সব মানুষ বিয়ার আসরে আর তুমি এই খানে বইস্যা রইছ?"

"না, না এমনেই ভাই!"

নিতাই ড্যাব ড্যাবা দুটো চোখ উচিয়ে ধরে।

"আমি সবই জানি ভাই, কি করবা কও; বুড়া শকুনে যদি নজর দেয়—"

রায়েবালির গলাটা সহসা থম থম করতে থাকে।

"আমার লেইগ্যা কি রইল ভাই? কপিলারে বড় ভালবাসছিলাম—"

আকুল হয়ে উঠল নিতাই। বলতে থাকে একটা অস্থির আর আচ্ছন্ন গলায়—"ভালবাসলে এমুন ছ্যাচা খাইতে হয়—"

রায়েবালি কিছু বলে উঠতে পারে না। তার কথার পরমায়ু শেষ হয়ে গিয়েছে একেবারেই। নিতাইর বুকের চিতাটা থেকে এক শিষ্ আগুন কি পাখ্না মেলেছে রায়েবালির মধ্যেও ?

হঠাৎ রায়েবালি বলে ওঠে—"জানি না—ভাল তো আর কোনদিনই বাসি নাই !"

গোলক কলাপাতাখানা টেনে হৈ হল্লা করে উঠল।

তুফানী নিষ্পলক চেয়ে থাকে।

গোলক বলে—"হয়, হয়, আমাব পাতেই দেন তো বিয়ান একখান বোয়াল মাছের কোল ! দেন, দেন—একখান না সাতখান।"

তবে কি রঙ্গিলা নায়েব মাঝির পালে বাতাস লাগে নি কপিলাব—নিগুণ কথা কি তাব বলা শেষ হয়ে গিয়েছে কোন কেশবতীর কানে ! কপিলা কি তার জীবনে একটা চকিত মেঘ ? "ঐ কি বিয়ান, বিয়াইএর লেইগ্যা বুঝি পরাণটা চরচরায় ! তবে যান অন্য মানুষ পাঠাইয়া দেন, এট্টু খাই জুইতমত ; এমুন একটা শুভ দিন !"

সত্যিই তো ! ভাবি বেমানানমত অন্যমনা হয়ে গিয়েছিল তুফানী। থতমত খায় সে, বলে—"এই যে দেই বিয়াই।"

পাতে মাছ দিতে দিতে ফিসফিসিয়ে ওঠে তুফানী, বলে ; "একটা মানুষেরে ঠকানের কি কামটা আছিল আপনের ?"

কোন জবাব দেয় না গোলক।

তুফানী ফিকির খোঁজে খানিকটা দাঁড়াবার। বলে, "কেমন হইছে মাছের ঝোলানি ?"

গোলক ছড়া কাটে—

"গুণালীতে ভাজছে পিঠা,

লবণে হইছে কটকইট্যা।"

তুফানী ফিকফিকিয়ে হেসে ওঠে—"কোন জিনিসের কি সোয়াদ বোঝেন আপনে ?"

"বুঝি না তবে !"

গোলক মুখ তোলে।

তুফানী হাসি ছিটায় একমুখ। বলে—"বোঝেন ছাই। কপিলা কি চুকা আছিল বাঘা তেতুলের লাখান ?"

একটা মুহূর্তও দাঁড়াল না তুফানী। মাছের পাতিলটা হাতে নিয়ে নেমে এলো উঠানে। বাতাবী লেবু গাছটা ফলেফসলে ভরে উঠেছে কানায় কানায়। গোলক একটা হাত-ভরা গ্রাস নিয়ে বসে রইল চুপচাপ, একেবারেই স্পন্দনহীন।

মধুটুকুরি আম গাছটা থেকে ডিঙির রশিটা সবে খুলেছে গোলক, পিছন থেকে রাঙা চেলির খসখসানি ভেসে আসে। কোন অবসরে যেন কপিলা চলে এসেছে এখানে। চারদিক একেবারে নিরালা নির্জ্জন। শাখা, সিঁদুরে ভারি মোলায়েম লাগছে কপিলাকে। এক পলক বিস্ময়-ভরা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইল রঙ্গিলা নায়ের মাঝি।

কপিলা মেঘ-ভরা গলায় বলে—"দুইটা দিন আগে আইলে—" আর বলতে পারে না। স্বরটা কেমন যেন ধরে আসে তার।

"পারি নাই। ঢপ গাইতে গেছিলাম সেই কলসকাঠি—বরিশাল।"

"আমারে কি দিয়া গেলা গোলকদাদা ? কি অপরাধ করছিলাম আমি তোমার কাছে ?"

কান্নায় ভাঙাচোরা হয়ে যায় কপিলা ; কাউগাছটার পিঠে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়। গোলক ধীরে ধীরে বলে—"অপরাধ তোমারও না, আমারও না, আমাগো অদ্দেষ্ট !"

"আমি মানি না ঐ পোড়া অদ্দেষ্ট ; এই সিন্দুর মুছতে আছি ; তোমার লগে আমারে লও ; আর যামু না ঐ বুড়া বান্দরের কাছে।"

"ছিঃ, অমুন কথা কয় না ; তুমি যাও। তুমি এখন পরস্তীরি (পরস্ত্রী)। মানুষে মন্দ কইব এমুন অবস্থায় দেখলে।"

"কউক।" ব্যাকুল বিহ্বল গলায় বলে ওঠে কপিলা।

আর কোন জবাব দেয় না গোলক। বৈঠাটা তুলে ধীরে ধীরে চাপ দেয় জলে।

খানিকটা পরে খালের দূর বাঁক থেকে একটা গলা ভেসে এ'ল। গোলক গাইছে কান্নামাখানো গলা ছিটিয়ে ছিটিয়ে—

বইস্যা কান্দে ফুলের ভ্রমর, উইড়া কান্দে কাগা।
শিশুকালে করলাম পিরীত, যৈবনকালে দাগা ॥
রে বন্ধু যৈবনকালে দাগা।
সুজন চিন্যা পিরীত করা বড় বিষম ল্যাঠা।
ভাল ফুল তুলিতে গেলে অঙ্গে লাগে কাঁটা ॥
রে বন্ধু অঙ্গে লাগে কাঁটা।

কাউ গাছটার পিঠে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কপিলা। একটা আকুল আবেশে তার সমস্ত মনটা জড়ানো ; সমস্ত দেহটা আচ্ছন্ন। হু হু করে ওঠে বুকটা।

বার

হিজলতলীর খালে নায়ে উঠবার আগে নিতাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে কপিলা মলখাড়ুর বাজনাটা বাজিয়েছিল একটু তেজী করেই।

সেই মল এখন ঝমঝম করে শ্রীধর মণ্ডলের ঢেউখেলানো ঝকমকে টিনে-ছাওয়া এ-ভিটে, সে-ভিটের ঘরগুলোতে। কপিলা ঢালা উঠানের ওপর দিয়ে ঘুরপাক খায় যখন তখন।

শীতল পাটির ওপর বসে হুঁকোটা টানতে টানতে মনটা স্বপ্নাতুর হয়ে ওঠে শ্রীধরের। আজকাল কলপ আর আতরের মাত্রাটা চড়িয়েছে বেমানান মত। সব সময় চারপাশে একটা মন্থর গন্ধের কুয়াশা ছড়ানো থাকে। সুগন্ধি তামাকের বাস ওঠে ভুর ভুর করে। কপিলার আল-গোছ চলা-ফেরা আর তরলায়িত যৌবনের জোয়ারে শ্রীধরের মনটা নাকানি-চুবানি খেতে থাকে কেমন একটা দিশাহারা উল্লাসে। হিজলতলীর খালে দেখা 'কেশবতী কইন্যা' তবে ধরা দিল তার মল-খাড়ুর ফাঁদে! ভাবতেও কেমন যেন শির শির করতে থাকে বুকটা।. খুশীর খুসবো ছোটে মনের তলা দিয়ে। সহসা চেতনাটা কেমন যেন ঘুলিয়ে ওঠে। এক আঁটি বিচালির মত চুল-গুলোর তলা দিয়ে চকচকে টাকের মসৃণ জমিটায় হাত বুলাতে বুলাতে শ্রীধর ভাবতে থাকে। চেতনার ওপর কি যেন একটা পাক খেয়ে উঠল বার কয়েক। হ্যাঁ, যৌবনটা তার কয়েকটা যুগ পেছনের একটা ধূসর বাঁকে হারিয়ে গিয়েছে। আজ আর জীবনের নৌকা ঘুরিয়ে সে ভূমিতে যাওয়ার কোন এক্তিয়ারই তার নেই। পালে বাতাস লেগেছে জোর।

এগিয়ে যেতে হবেই তাকে। পিছু হটে অন্তত তিনটে যুগ আগে উজিয়ে যাওয়ার কোন আশ্বাসই তার হাল কি পালের কলিজায় নেই।

এই মুহূর্তে কেউ যদি কয়েকটা বছরের জন্য একটা উত্তপ্ত যৌবন কর্জ দিতে পারত! কিন্তু না—তা হয় না! মহাভারতের মহাসময় আজ আর নেই। কালটা নেহাতই কলি!

কপিলার ঝিলমিলে ডুরে শাড়ীটার ঠসকের দিকে একবার, আর নিজের বেখাপ্পা ঝোলা মাংসের দিকে একবার তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাসের দমকায় ভেঙে পড়ল শ্রীধর। পট পট করে জঙ্গল গোঁফটা থেকে তুলেই ফেলল কয়েকগাছা। তারপর পাশের আতর দানটা একেবারে উপুড় করে উজাড় করে দেয় তালুর সীমানায়।

কপিলা এসেছিল জুতের ঘরে।

শ্রীধর গলার স্বরটা মোলায়েম করে ডাকে, "রসবতী—অ রসবতী—"

কপিলা পিছন ফিরে চোখের এক পলক তরলতা ছিটিয়ে দেয়। বলে—

"ক্যান?"

"কর কি?"

শ্রীধর আবেশে অনার্য থুত্‌নিটা থাবলাতে থাকে বন্য নখগুলো দিয়ে।

"কাম করি।"

"কাম?"

আগ্নেয় হয়ে উঠল দু'শ কাণি দোফ্‌লা জমিনের মালিক রাঙামিলার শ্রীধর মণ্ডলের গলাটা।

"কামের লেইগ্যা বউ আনছি সোয়া এক হালি। গোমস্তা বান্দা রাখছি সাড়ে আষ্ট গণ্ডা। তোমারে কি কামের লেইগ্যা বিয়া করছি না কি রসবতী? কে কইছে তোমারে কাম করতে? কার ঘাড়ে কয়টা মাথা?"

"কেউ কয় নাই আমারে কাম করতে। আমিই করি।"

কপিলা বুক নাচিয়ে, ভুরু ঝাঁকিয়ে তকতকে উঠানটায় গিয়ে নামে। শ্রীধর ধীরে ধীরে ফরসীর নলে ঠোঁট দু'টো ঠেকায়। সহসা একটা কুটিল সন্দেহে আচ্ছন্ন হয়ে গেল মনটা। কয়েকটা দিন আগের একটা ঘটনা। খালের ধারে এক সারি হিজল গাছ। সন্ধ্যা ঘনীভূত হয়েছে সবেমাত্র হিজল-পাতার ফাঁকে ফাঁকে। জোনাকি ঝিলমিলিযে উঠেছে। আর এমনি সময় শ্রীধর গিয়েছিল গর্ভবতী কালি গাইটার তদারকে গোয়ালে। খালের পার দিয়ে পথ; ফিরতি মুখে একটা আলগোছ ফিসফিসানিতে চমকে উঠেছিল। সত্তর বছর বয়স হলেও চক্ষু দুটো সতেরো বছরেব মতই কাঁচা—তেজ আছে নজরের, জোয়ান মরদের মত। দেখেই এক লহমায় চিনে ফেলল শ্রীধর। কপিলা আর জীবন—দুজনেই দুজনের কাছাকাছি সন্নিহিত হয়ে দাড়িয়েছিল। একটা গলা খাকারি দিয়ে উঠেছিল শ্রীধর। ত্রস্তে জীবন খাল সাঁতরে ওপারে গিয়ে উঠেছিল আর কপিলা বেতবাঁশের ঝোপটা পেরিয়ে পাকের ঘরের উঠানে এসে উঠেছিল।

সেই থেকে মনের আকাশটা ঘিরে এক আস্তর কুটিল সন্দেহের রঙ ছড়িয়ে রয়েছে। শুয়ে বসে স্বোয়াস্তি নেই। নাঃ; জীবনের জন্যে আজই একটা পাত্রীর ব্যবস্থা করতে হবে। গুড়ুক গুড়ুক করে ফরসীর নলে তেজী তেজী টান লাগায় শ্রীধর।

সুমুখ দিয়ে পতিতের ছোট মেয়েটা যাচ্ছিল ওপাশে। ডাক দেয় শ্রীধর—"এই কুসুম, ছোট ঠাকুমারে ডাক দিয়া দে তো; চুপি চুপি গিয়া ক'বি; কেউ যেন না শোনে! বুঝছস্?"

"বুঝছি।"

মাথা ঝাঁকিয়ে কুসুম চলে গেল কপিলার তল্লাসে।

খানিকটা পর কপিলা এসে সামনে দাঁড়ায়।

শ্রীধর বলে—"আস—আস—রসবতী।"

"আমার কাম আছে।"

কপিলা আলগোছে গলাটা ছেড়ে দেয়।

"কি কাম?"

"ধান বানুম।"

"ক্যান? ক্যান? ধান বাননের লেইগ্যা মানুষ রাখছি আড়াই গণ্ডা। তুমি মাজা লাড়বা ক্যান?" ঝন ঝন করে ওঠে দু'শ কানি দোফসলা জমিনের মালিক শ্রীধর মণ্ডলের রুক্ষ গলাটা।

"কাম না করলে আমার ঘুম আসে না।"

কপিলা কোমরে ঝাঁকানি দেয়, উরুতে নাচানির ঠমক তোলে।

"বাইতে গা হাতাইয়া দিমু, কোমর টিপ্যা দিমু—তা হইলেই ঘুম আসব।"

আশ্চর্য তরল শোনায় শ্রীধর মণ্ডলের কণ্ঠ।

"উহু, কাম আমি করুমই।"—কপিলা স্বরটা দুলিয়ে দেয় গমকের ঢেউএ। "কাম যদি করতে হয়, তো পান সাইজো কইলকাতার মসলা দিয়া। আমি পান বড় ভালবাসি।" শ্রীধর মণ্ডল এগিয়ে এল আরো খানিকটা। ফরসির নলটা পড়ে রইল পিছনে।

কপিলা মুখ বাঁকায়, বলে—"পানের গন্ধে আমার ভিরমি আসে।"

"তবে চুল বাইন্ধো রাঙ্গা ফিতা দিয়া।"

"চুল বানতে (বাঁধতে) পরাণ পোড়ায়।"

কপিলা এক পশলা তেরছা নজর ছিটিয়ে দেয়। আর একটা খাড়া ঝিলিক যেন বয়ে গেল শ্রীধরের টাকের চরো জমিনটা থেকে পায়ের পাতা অবধি।

শ্রীধর বলে—"তবে মুখ মাইজো গন্ধ সাবান দিয়া।"

"উঁহু, সাজি মাটিই আমার ভাল।"

শ্রীধর হাঁ—ই। করে ওঠে—"মাজছ নাকি সাজিমাটি দিয়া?"

"হুঁ—রোজ পাচ ফির।"

"আহা—গালের ছাল যায় নাই তো।"

"গেছে। তবে সাজি মাটিতে না।"

"তবে কিসে?"

"আপনের হাতের ঘষায়। হাতখান তো করাতের লাখান (মত)।"

তাই তো! ভাবি অস্বস্তি লাগে নিজের কাছেই। ফাটা-ফাটা হাতের তালুতে কড়া পড়েছে একরাশ। কপিলার নরম নিটোল গালে বসে যায় ধারালো কোচের ফলার মতই। আজই উখো দিয়ে ঘষে উড়িয়ে দিতে হবে সমস্ত হাতের তালুটা।

একটা গমকের ঘূর্ণি তুলে কপিলা নেমে গেল ঢালা উঠানটায়।

শ্রীধর একেবারেই স্তিমিত হয়ে যায়। বলে—"রসবতী—অ—রসবতী আমার লগে দুই একটা রসের প্যাচাল (কথা) কও। আমি বইস্যা থাকি একা একা।"

"একলা থাকবেন ক্যান? একটা হুলা বিড়াল লইয়া বইস্যা থাকেন। পাঠাইয়া দিমু?" এক ঝলক ধোঁয়ানো তুষের মত আগুন-হাসি ছিটিয়ে কপিলা সরে গেল সমুখ থেকে। অনেকদিন পর সত্যি সত্যিই কুঞ্চিত মাংসের তল থেকে আজ বাতের ব্যথাটা বেহিসাব মত চাগিয়ে উঠেছে। বুকের ভিতরটায় দমকে দমকে হাফরের মত নিঃশ্বাস উঠছে ঠেলে ঠেলে। গালের পিঠে হাতটা চাপিয়ে শ্রীধর বসে থাকে ঠায়। ভাবে সত্তর বছরের শিথিল বাঁধ দিয়ে কি সম্ভব আঠারো বছরের উন্মত্ত যৌবনের বন্যাকে বেঁধে রাখা?

খানিকটা পর মেজ বৌ এসে উঠল পৈঠেতে। চোখাচোখি হতেই

অন্য দিকে মুখটা ঘুরিয়ে বসে থাকে শ্রীধর।

শানানো গলায় কল কল করে ওঠে মেঝ বৌ—"নিঃবইংশ্যা, পোড়া-কপাইল্যা, যমের অরুচি—চক্ষে কি ধূলপড়া পড়ছে, যে মুখটা কাল প্যাচাটার লাখান কইরা রাখছে!"

"ও, তুই মাইঝা বৌ। আয়, ব'স্।" শ্রীধর মুখ ফিরায়।

"দিন রাইত তো বুড়া মইষের লাখান (মত) পইড়্যা থাক। নজর রাখ কোন দিকে?"

শ্রীধর পুরোপুরি চোখে তাকায় এবার। বলে—"কি হইছে?"

"আমার জীবন তো বাইব হইয়া যায়।"

"ক্যান্? জীবনের হইল কি?"

"হইল কি? নিঃবইংশ্যা, ড্যাকরা, যমের অরুচি—হইব আবার কি? চিতায় ওঠনের বয়স, কই সাদা থান পইরা খাটে শুইব, তা না রাঙ্গা চেলি-পরা পেত্নী ববে। লাজ নাই তোমার, জোয়ান জোয়ান পোলার সামনে বিয়ার নাচ নাচতে!"

মেঝ বৌ খিঁচিয়ে ওঠে। গলায় ঝাঁকানি দেয় তেজী তেজী।

"আস্তে মাইঝা বৌ, নয়া বৌ আবার শুনব।"

শ্রীধর ইতি-উতি নজর ছড়ায়।

মেঝ বৌ আবার ঝাঝালো হয়ে ওঠে—"কার ডরে আমি মুখ বুজামু? তোর ঐ জোয়ান পেত্নীর ডরে?"

অসহায় গলায় রাঙামিলার শ্রীধর মণ্ডল বলে—"আমি কি কইছি কারুর ডরে?"

এইবার গলাটা নামায় মেঝ বৌ—"জীবনের লেইগ্যা একটা মাইয়ার খোঁজ দেখ।"

"ও, এই কথা! আমি ভাবতে আছিলাম আবার কী হইল! কাইলই

মানুষ পাঠামু ওলাবিবিতলা। যোগেন মণ্ডলের একটা বইন নাকি আছে ডাগর।"

"আইচ্ছা, মাঘ মাসেই বিয়া দিমু কিন্তুক…"

"হয়—হয়—"

মেঝ বৌ চলে গেল।

দু'শ কানি দোফসলা জমিনের মালিক বাঙামিলার শ্রীধর মণ্ডল আতরমাখানো জঙ্গল গোঁফটা থেকে পট পট করে আরো কয়েকগাছা তুলে ফেলল।

মেঝবৌর গলার ধার, জীবনের জন্য সম্বন্ধের তদারক করা, কিছুই মনের পর্দায় ছায়া রাখতে পারছে না। সব সময় ঐ একই ভাবনা।—জটিল চিন্তার অস্বস্তিতে মনটা ছত্রখান হতে থাকে তার। কপিলা—কপিলা।—

একটা দণ্ডও সুস্থির হয়ে পাশে এসে বসে না কপিলা। সব সময় ঘুরপাক খায় এ ঘরে সে ঘরে। তবে কি তার বার্দ্ধক্যের নদীতে চরা পড়েছে দুকূল ছাপিয়ে, ঐ মাথার টাকের মতই? কপিলার ময়ূরপঙ্খী সে ঘাটে আসবে না আর কোনদিনই? সব সময়েই চলবে এড়িয়ে এড়িয়ে? পেশীর তলায় আর ঝোলা মাংসের আনাচে কানাচে বাতের চড় ব্যথাটা আড়মোড়া ভাঙে। বুকটা পোঁয়াতে থাকে কিসের একটা বেদনায়, কী এক আগুনে!

বিকেলের দিকে নিতাই এসে দাঁড়াল সামনাসামনি। বলে—"আমারে ছাইড়া দেন কত্তা, আমি যামু গিয়া।"

শ্রীধর একেবারে চমকে ওঠে। ফরসির নলটা মুখ থেকে টিলে হয়ে পড়ে যায় একপাশে। বলে—"ক্যান? যাওনের কি হইল?"

"আগের মত কাম করতে পারি না।"

এমন মানুষ হাতছাড়া হয়ে যাওয়া একটা দামী তালুক নিলাম হওয়ার সামিল। শ্রীধর হাঁ-হাঁ করে ওঠে—"না করলা কাম, তুমি থাক।"

"আকামের ভাত আমি খাইতে পারি না।"

নিতাই জবাব দেয় একেবারেই স্পষ্টাস্পষ্টি। এতটুকু আবিলতা নেই কোথায়ও।

"না, না তোমার যাওন হইব না; এই কি একটা কথার লাখান কথা হইল। আমি ভাবছি তোমার লেইগ্যা যাইয়া দেখুম একটা—"

শ্রীধর এগিয়ে এলো আরো খানিকটা।

নিতাই পরিষ্কার জবাব দেয়—"আমি তো বিয়া করছি এক ফির।"

"সে তো জানিই আমি; কিন্তুক একটা বিয়া করলে যে আর বিয়া করতে হইব না, এর কোন অর্থ নাই। আমি নিজে যাইয়া যাইয়া দেইখ্যা আসুম কাইল।"

শ্রীধর এগিয়ে এসে হাত দুটো চেপে ধরে নিতাইর।

"না—না সে হয় না কত্তা—আমি এই রবিশস্যের খন্দটা গেলেই যামু গিয়া।"

নিতাইর গলাটা কি স্পষ্ট, কি কঠিন, কি ঋজু! অপলকে তার মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল শ্রীধর মণ্ডল।

ভারি অসহায় বোধ হচ্ছে নিজেকে। এই দু'শ কানি দোফসলা জমির তদ্বির করা কি একটা মুখের কথা! এতদিন সে পরম নিশ্চিন্তেই ঘুমাতে পারত, সব ঝামেলা-ঝক্কি নিতাইর ঘাড়ে চাপিয়ে।

শেষ চেষ্টা করল শ্রীধর—"আর 'না' কয় না। আমার কথাটা রাখ।"

কোন জবাব না দিয়েই নিতাই চলে গেল সুমুখ থেকে। আর একটু পরেই কথাটা ছড়িয়ে পড়ল পাকের ঘর থেকে জুতের ঘরে, ধানের

ডোলটা পেরিয়ে একেবারে কান্ত-হর্ষদের সীমানায়। নানান গলার ঢেউএ ঢেউএ ভেসে গেল খবরটা।

ও রঙ্গিলা নায়ের মাঝি
এই ঘাটে ভিড়াইও রে নাও
নিগুণ কথা কইয়া যাও রে—
আমি পরাণ পাইত্যা শুনি।

রঙ্গিলা নাওএর মাঝি হিজলতলীর খালে নাও ভিড়িয়ে 'নিগুণ কথা' বলে যায় নি; আর কোন দিনও সে নৌকার পাল দেখা যাবে না। কপিলার বুকটা অসহ্য বেদনায় উথলপাথল হয়ে উঠে।

বউন্যা ফুলের মালা গাইথ্যা হে সুন্দরী
দিব তোমার গলেতে—
হে সোনার বরন রাজকইন্যা।
ময়ূরপঙ্খী নাও ভিড়িল ঘাটে গো।
কেশবতী রাজকইন্যা চৌখ মেলিয়া চাও—

আজ আবার তার বন্দর থেকে নিতাই নোঙর তুলছে। কই সেও তো সোনার বরণ 'রাজকইন্যার' গলায় বউন্যা ফুলের মাতাল করা মালা পরিয়ে দিয়ে গেল না!

সন্ধ্যার দিকে কপিলা চলে এ'ল নিতাইর সতের-বন্দের চৌচালা ঘরখানায়। চুপচাপ বসে ছিল নিতাই। শীতের মরা খালটার দিকে উদাস নজরটা ছড়িয়ে রয়েছে তার।

কপিলা খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। বলে—"বান্দা না কি যাস গিয়া ?"

"হয়—হয়—তোর রাজত্বি লইয়া তুই সুখে থাক।"

কেমন একটা অভিমানী গলায় যেন বলে ওঠে নিতাই।

"তুই গেলে আমার পা টিপব কে ?"

"ক্যান, বুড়া বান্দবে।"

"মুখ সামাল দিয়া কথা ক'বি বান্দা; আমার সোয়ামীরে যা খুশী ক'বি না কি ?"

কপিলা ঝিলকিয়ে ওঠে।

"কে কার বান্দা ? আমারে বান্দা রাখে এমুন বাদ্‌শা জন্মায় নাই।"

দাওয়া থেকে উঠে ঘরের ভিতর চলে এ'ল নিতাই। তারপর ঝাঁপটা টেনে দেয় জোর হাতে।

সহসা ঝাঁপটার ওপর ভেঙে পড়ে কপিলা। কান্না-ভাঙা গলায় বলে ওঠে সে—'ঝাঁপটা খোল্‌ নিতাই—তোর লগে আমার অনেক কথা আছে।"

ভিতর থেকে কোন জবাব আসে না।

তের

নিতাই আর রায়েবালি যাবে চরজলমার গঞ্জে।

রবিশস্যের গন্দ। কলাই, মুগ-মুসুরি, সর্ষে-কাউন উঠেছে বিস্তর। সারা বৎসরের মত খোরাকি ডোলে তুলে বাদবাকী তোলা হ'ল নৌকায়। বেচা-কেনা সেরে রাতারাতি ফিরে আসবে দু'জনে।

সকালের খাওয়া সেরে রায়েবালি চলে এ'ল বাইর বাড়ী; সরবতী আমগাছটার নীচে বসে গড়িমসি করতে করতে তামাক টানতে থাকে সে।

নিতাই চলে এ'ল অন্দর মহলে।

কপিলা মলখাড়ুর বাজনা বাজিয়ে উত্তরের ভিটির ঘরখানায় যাচ্ছিল। নিতাইর মনটা ঝমঝম করে বেজে ওঠে ঐ বাজনার উল্লাসে।

জীবন আর পরাণ কলাবতী আমগাছটার শিকড়ে বসেছিল চুপচাপ। চোখ দুটো বীভৎস রকমের তীক্ষ্ণ করে কপিলার দিকে চেয়ে থাকে জীবন। একমুখ ঝোল টেনে নেয় পরাণ। কপিলা—কপিলা—

নিতাই গলা খাঁকারি দেয়—"ঐ কি রে পরাণ!"

"আমি না নিতাই দাদা, জীবইন্যাই তো আমারে খালি কয়।"

ত্রস্তে উঠে পাকের ঘরের পিছন দিয়ে উধাও হয়ে যায় পরাণ।

"কি রে জীবন? তোর বাপের কাছে কমু না কি?"

নিতাই দুটো ভয়ঙ্কর চোখ তুলে ধরে।

"আমি কি করছি? আমি তো বইস্যা আছিলাম এমনেই।"

খানিকটা তো-তো করে জীবনও কাহারপাড়ার পথটা ধরল করমচা ঝোপটা পাশে রেখে।

একটা বেতের ডালায় মুড়ি আর রসগুড় নিয়ে সুমুখে এসে দাঁড়াল কপিলা। বলে—"খা নিতাই।"

"খিদার গরজ নাই এখন।"

নিতাই আলগোছে মুখটা তুলে ধরে।

"খা, খাইলেই গরজ হইব। খাইতেই হইব।"

একরকম জিদই ধরল কপিলা।

একপলক কপিলার মুখে নজরটা ছড়িয়ে দেয় নিতাই, তারপরই মুড়ির সাজিটা টেনে নিল হাতে। বলে—"দে, দে, শ্যাষবারের মত তোর হাতেই খাইয়া যাই; মনে রাখুম জীবনভর।"

কপিলার পরাণটায় যেন চিড় ধরে গেল সহসা। সে কি! নিতাই কি তবে চলে যাবে সত্যি সত্যিই! আকুল-বিহ্বল গলায় বলে ওঠে কপিলা—"কোথায় যাবি নিতাই?"

"যেখানে দুই চোখ টাইন্যা নেয়, সেইখানেই যামু।"

সহসা নিতাইর চোখ দুটো উদাস হয়ে যায়, চোখের পাত ভরে আসে একটা অর্থহীন নির্লিপ্তি।

"আমি যদি না যাইতে দেই তোরে?"

কপিলা অনেকটা ঘনীভূত হয়ে আসে নিতাইর কাছাকাছি।

"আইজ আর তা হয় না সুন্দরী।"

"ক্যান?"

টানা টানা চোখে একটা তরল আমেজ ঘনিয়ে ককিয়ে ওঠে কপিলা।

'তুই তো বোঝস সবই। তবে আর জিগাস ক্যান?"

সহসা নিতাই উঠে পড়ে।

আরও খানিকটা এগিয়ে এল কপিলা।

আচ্ছন্ন গলায় বলে ওঠে সে—"তোরে আমি যাইতে দিমু না, কিছুতে না।"

আমার যাইতেই হইব ; গঞ্জে কলই-মুসুরি বেইচ্যা ট্যাকা পাঠাইয়া দিমু রায়েবালির লগে। তারপর ঐ খান থিকাই—"

"যাবি কোথায় ? আমার কাছে মনটা খোলসা কইর‍্যা ক' দেখি।"

"সালিনার কাছে।"

ধীরে ধীরে নির্মেঘ গলায় বলে ওঠে নিতাই।

একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল কপিলা। এক পলক নজর ছড়িয়ে আসন্ন বসন্ত চোখ দুটো সরিয়ে নেয় সে ; তারপর জুতের ঘরের দাওয়ায় চলে আসে।

শ্রীধরের বাতের ব্যথাটা ঝোলা ঝোলা মাংসের তলায় সাঙ্ঘাতিক হয়ে উঠেছে। কপিলা যেন কেমনতর হয়ে গেছে। সারাটা দিনমান ডাক-তল্লাস নিয়েও কাছাকাছি আনতে পারা যায় না। এক আধবারও। পট পট করে টানতে টানতে গোঁফের ঘনত্বটা প্রায় অর্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে। বিচালির মত এক আঁটি চুল আজকাল আর কলপের সোহাগে তামাটে সৌন্দর্য পায় না। টাকের চরটা আড়ে-দিঘে আরো বেড়েছে ইঞ্চি দুয়েক।

এমন একটা ঐতিহাসিক মুহূর্তে কবরির নলটাই যা এক ভরসা। সারা দিন শ্রীধর তামাক পোড়ায় ঢিমে তেতলা তালে। কিন্তু কপিলার উত্তপ্ত যৌবনের স্বাদ কি আর কল্কির আগায় আছে ? তামাকের মতই মনটা পুড়তে থাকে তার। জ্বলতে থাকে ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে।

সহসা একটা সচেতন আশঙ্কায় দু'শ কানি দোফসলা জমিনের মালিক রাঙামিলার শ্রীধর মণ্ডলের মনটা একেবারে ককিয়ে ওঠে। সত্তর বছরের আলগা বাঁধ দিয়ে কি বাঁধা সম্ভব আঠারো বছরের উদ্দাম বন্যা !,

কপিলাকে সুমুখে দেখে একেবারে কেমন যেন হয়ে যায় শ্রীধর। টাকের চরো জমিনটায় থাবলা দিতে থাকে ঘন ঘন। বলে কেমন একটা

জড়ানো-জড়ানো গলায়—"হেঁ-হেঁ, আয় রসবতী, আয়,—হেঁ-হেঁ, আয়, এদিকে আয় লো সুন্দরী ; হেঁ-হেঁ—"

সামনের মাড়ির গোটা সাতেক দাঁত শ্রীধরের মায়া ছেড়ে চলে গেছে। সে প্রায় একযুগ আগের ইতিকথা। তারই ফাঁক দিয়ে এক-পশলা ঝোল বেরিয়ে এ'ল। কালই গঞ্জে যাবে ; রসময় বলছিল জোয়ান বয়সের দাঁত নাকি পাওয়া যায় টাকা দিলে ! সব ডাক্তারী ভেল্‌কি !

কপিলা একেবারে সন্নিহিত হয়ে এ'ল শ্রীধরের বুকের পালকের মত বুকের লোমগুলোর কাছাকাছি। তরল উচ্ছলতায় মাখামাখি গলায় সে বলে—"কইলকাতার মসল্লা দিয়া পান সাজছি, খাইবেন এক খিলি ?"

"হেঁ-হেঁ, এক খিলি না রসবতী, বিশ খিলি খামু। হেঁ-হেঁ, আর একটু কাছে আয় কপিলা।" মোমের মতই গলে পড়বার দাখিল শ্রীধরের।

"আমি তো কাছে আছি আপনের।"

"হেঁ-হেঁ, তা তো ঠিকই। তা তো ঠিকই।"

"একটা কথা কমু—" ধীরে ধীরে কপিলা মুখটা তুলে ধরে।

হাঁ-হাঁ করে ওঠে শ্রীধর—"একটা ক্যান, লাখ কথা ক' বউ ; আমি পরাণ খাইত্যা শুনি।"

"নিতাই যেন না যায় কোনখানে। কামের মানুষটা—"

দু'শ কানি দোফসলা জমিনের মালিক রাঙামিলার শ্রীধর মণ্ডলের সত্তর বছরের বয়সজীর্ণ গলায় পঁচিশ বছরের ঢল নেমে এল এক মুহূর্তে। হাঁক দেয় সে—"নিতাই অ-নিতাই—"

ততক্ষণে রবিশস্যভরা নাও নিয়ে রায়েবালি আর নিতাই কঙ্কাবতীর খালে তিনটে বাঁক ভাটিয়ে গিয়েছে। শ্রীধরের গলা অতদূর পৌঁছবে না। কপিলা যদি ডাকত একবার মনের ভিতর থেকে।

শ্রীধর ভাবছে—ভাবছে আসমান-জমিন একাকার করে। কপিলার

উত্তপ্ত সোহাগের সাজিমাটি দিয়ে মেজেঘষে ধপধপে করে নেবে তার সন্দিগ্ধ কালো মনটা।

কপিলা বসে রইল চুপচাপ।

"তুই একটা রসের কথা ক' না, বউ।"

রাঙামিলার শ্রীধর মণ্ডল সত্তর বছরের অসমর্থ হাত দু'টো দিয়ে কপিলার আঠারো বছরের উত্তপ্ত কবজি চেপে ধরে। কপিলা একবার তেরছা নজর ছড়িয়ে অন্য দিকে সরিয়ে নেয়।

"ক', ক' রসবতী, তুই কথা না কইলে আমার ঘুম আসে না।"

আকুল হয়ে উঠল শ্রীধর।

"কবিরাজী তেল মাইখ্যেন, ঘুম আসব আপনেই।"

মুখ না তুলেই জবাব জোগায় কপিলা।

"হেঁ-হেঁ, তুইই আমার কবিরাজী তেল।"

একটা কর্কশ রসিকতায় ভেঙে পড়ে শ্রীধর।

"উহুঁ, আমি কবিরাজী তেল না, এ্যালুপিথির ইংলিশন, একবার বিনলে (বিঁধলে) জন্মের মত ঘুম যাইব।"—কপিলা নাকের বেসরে ঝাঁকানি দেয় আর শ্রীধরের সারাটা মন আবার এলোমেলো হয়ে যেতে থাকে।

"তা হউক—তুই কাছে থাকলে আমার ঘুমের কাম নাই।"

শ্রীধর থাবার মধ্যে কপিলার মোলায়েম মুঠো কচলাতে থাকে।

কপিলা মুখ বাঁকায়, কোমর ঝাঁকায়, "হাত ছাড়েন, চাল তো গেল।"

তাই তো! তাই তো! উখো দিয়ে এখনও তো কাঁটার দাঁতের মত কড়াগুলো উড়িয়ে দেওয়া হয় নি। আচমকা শ্রীধর হাত দুটো ছেড়ে দেয়, বলে—"লাগল বউ।"

"বেশী না, কবজির ব্যথা সারতে তেল ডলতে লাগব সোয়া সের।"

"আহা-হা।"

শ্রীধর ভ্যাবাচ্যাকা খায়; তো-তো করতে থাকে। তাই তো! তাই তো! ভারি আহাম্মকি হয়ে গেছে তো! আবারও বলে ওঠে সে—"যতীন কবিরাজেরে খবর দিমু একটা?"

"দেন, আপনের ঐ খড়ের লাখান আধা আটি চুলেরে সাফ কইরা দেওনের লেইগা।" আর কোন কথা বলে না কপিলা; সারা দেহে একটা তুফান তুলে উঠানে গিয়ে নামে শুধু।

আবারও শ্রীধর মণ্ডলের ঢিলে মাংস পেশীর তলা দিয়ে বাতের ব্যথাটা ধিকি ধিকি জ্বলতে শুরু করল। রক্তের কণাগুলোতে আগুন ধরেছে যেন।

নিতাইর রবিশস্য-ভরা কোষ নাওখানা আউশখালি পেছনে রেখে এগিয়ে চলেছে চরজলমার দিকে। পাশাপাশি বেয়ে আসছে রায়েবালিও। কঙ্কাবতীর খালের শেষ বাঁকে শঙ্খচিলগুলো আকাশে চক্র দিয়ে চলেছে—ট্রি—ট্রি—ট্রি—

নিতাই ভাবছে আকাশ-পাতাল। রবিশস্যের ভরা পাইকারের নৌকায় তুলে দিয়ে সে ডিঙি ভাসাবে নিরুদ্দেশের ঠিকানায়। কেন, কেন যে মানুষের জীবনে এই জোয়ান বয়সটা আসে! এমন ক্ষ্যাপামি-ভরা উদ্দাম যৌবন! মনটা পুড়ে পুড়ে খাক থাকে হতে একটা দীর্ঘশ্বাসের আগুনে।

উঃ! সেই সরলা—তার মলগাড়ুর বাজনার পিছনে অমন একটা বিষের ভাণ্ড যে ছিল তা কি জানা ছিল আগেভাগে! তারপর কপিলা! তার ধারালো কথার শানানো ফলা এসে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে যায় মনটা।

না। আর কোনদিনই রাঙামিলায় নৌকা ভিড়াবে না নিতাই। পদ্মা-মেঘনার খরশান স্রোতের ওপর দিয়ে কোষ ডিঙি চালিয়ে যাবে বাদবাকী জীবনটা; খেয়াল খুশীর উল্লাসে। কিন্তু; কিন্তু; সে দিন কি কথা বলতে চেয়েছিল কপিলা? ঝাঁপের ওপর ককিয়ে ককিয়ে কেন, কেন উঠেছিল ডুঁশ কানি দোফসলা জমিনের মালিক রাঙামিলার শ্রীধর মণ্ডলের নয়া বৌ? না, না—ওসব নাকি-কান্নার মিহি সুতোয় মনটাকে জড়িয়ে নেবে না সে কোনদিনও। কপিলারা চিরটাকাল ঠমক-ঠসকের বর্শাই মেরেছে নিতাইদের কলিজায়। নিতাই খুব ভাল-মতই জানে। শিখেছে বুক থেকে অজস্র দীর্ঘশ্বাস ঝরিয়ে, চোখ থেকে লোনা জলের বন্যা নামিয়ে।

আচমকা রায়েবালি বলে—"আইজ ভাল রঙ্গের গান আছে গঞ্জে—"

"সে তো রাইতে।"

রায়েবালির গলায় নিশ্চিত আরামের কৌতূহল—"শুনুম রাইত ভর, শেষে সকালে নাও ছাড়ুম ঘর মুখি।"

"যা খুশী কইরো।"

নিতাইর গলাটা একান্তভাবেই নিরুত্তাপ।

"কি, একেবারে দেখি ভাইঙ্গা পড়ছ নিতাই ভাই! গলায় কি জোরবল নাই!"

রায়েবালি বৈঠাতে তেজী টান দিতে দিতে বলতে থাকে।

"হ, ভাই। জীবন ভর খালি ঠকলামই।"

"বলদ হইলে ঠকতে হয়ই।"

"কেমুন?" নিতাইর চোখদুটো প্রশ্নবোধক।

'মাইয়্যা লোক খালি চাথবা, গলায় বান্ধনের মতলব করবা না কোন কালে। তা হইলেই মরবা আর কি!"

বায়েবালি হাত-পা নেড়ে নেড়ে রসরঙ্গের বাতাসে নিতাইর বুদ্ধির কলি ফোটায়।

কোন কথা বলে না নিতাই।

ধীরে ধীরে নৌকা দুটো এসে পার পুঁতল চরজলমার হাটখোলায়।

সর্ষে-কাউন, মুগ-মুসুরি পাইকারের নৌকায় তুলে টাকা পয়সা নিয়ে নিল ঠিকঠাক। কিছুক্ষণ হ'ল সন্ধ্যেটা অন্ধকারের পাখনা ছড়িয়েছে। হাটখোলার মাঝামাঝি সামিয়ানা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। সারা রাত ধরে চলবে গান-যাত্রার আমেজী আয়োজন। ভাগচাষী, বর্গা কৃষাণ, হাটুরে মানুষ এসে জমায়েৎ হয়েছে সামিয়ানার তলায়। পুড়ছে মতিহারী তামাক, উঠছে মৌতাতের ধোঁয়া। আর তামাকের ধোঁয়ায় গেঁয়ো কুটুম্বিতা ঘন হয়ে উঠছে। ছলিমদ্দি আর একটু এগিয়ে আসে রসময়ের কোলের লাগোয়া।

ইতিমধ্যে গান শুরু হয়ে গেল—

নাগর তোমার মোহন বাঁশী কেন গো বাজাও—
পরাণ আমার ঘরের থিকা—
উইড্যা পুইড়্যা দাও।
নাগর তোমার বাঁশীর সুরে
বিষ না মধু—কইর‍্যাছি কি ভুল!
কুলের বধূ হইয়া আমি হারাইয়াছি কুল
তোমার বাঁশী শুনে শুনে কইর‍্যাছে আকুল।
মান হইর‍্যাছ, কুল লইয়াছ
পুইড়াছ মোর বুক
বিনা আগুনে জ্বইলা মরি, নাগর গো—

এই কি জ্বালা দিলা মোরে—
তুষের আগুন ধিকি ধিকি বিরহেরি দুখ।

সামিয়ানা-ভরা মানুষগুলো তরিবত করে কান উঁচিয়ে শুনতে থাকে। একটা নেশার কুয়াশা যেন ছড়িয়ে গিয়েছে সকলের মনে মনে।

কানের কাছে হাত এনে ছোকরা গাইছে নরম গলায়। স্বপ্নঘন স্বর ছিটিয়ে ছিটিয়ে।

ঘুম ভাইঙ্গা যায় নিশি ভোরে—
পরাণ পোড়ে তোমার তরে গো—
বাশী বাজে গো বাজে ; ঐ না কলাবনে—
হইব দেখা আন্ধার রাইতে
মানকচুর ডাউগ্যা দিয়া ছাতি ধরুম বুকে
বিষ্টি আসুক ঝমঝমাইয়া—
মনের উমে করুম গরম তোমার ভিজা বুক।

নেশা ধরে যায় ছোকরার।

ইতিমধ্যে রায়েবালি আর নিতাই এসে দাঁড়িয়েছে এক পাশে। তরিজুত করে গান শুনতে শুনতে রায়েবালি অন্যমনা হয়ে যায়।

নিতাইর মনের কোণা বেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস চুঁইয়ে আসতে থাকে। কই কোনদিন কোন কেশবতী তো মনের উম দিয়ে তার বুক গরম করে দেয় নি। আঁধার রাইতের বর্ষণ-ঘন আমেজে কোন কঙ্কাবতী তো তার বুকে সন্নিহিত হয়ে আসে নি। এই গান—না-না—এ কতকগুলো সাজানো গোছানো কথার জালিয়াতি। হিংস্র ভাবে ঝকমক করতে থাকে নিতাইর মুখ চোখ নিতাই একটা ঠেলা দেয় রায়েবালিকে—।

"আমার গানে মন লাগে না ভাই !"

"ক্যান, ক্যান ? এমুন তরিবতের গলা।"

রায়েবালির গলায় বিস্ময় চমকালো।

"কি জানি? তুমি গান শোন। আমি এট্টু খালের ঘাটে যাই।"

আর একদণ্ডও দাঁড়ায় না নিতাই। এক লহমায় পথটুকু পেরিয়ে চলে আসে একেবারে খালের ঘাটে। তারপর ডিঙির পাটাতনে বসে হাঁটুর উপর থুত্নিটা রাখে। একটা কান্নার পাখনা বুকের তেপান্তর জুড়ে ঝাপটাতে থাকে অবিরাম।

এখন যদি সালিনাকে পাওয়া যেত! আজকের এই ক্ষ্যাপা রাত্তিরটার জন্য? সালিনা তো এই গঞ্জেই এসে উঠেছে। নিতাই ধীরে ধীরে লালাভ দু'টো চোখ তুলে ধরে হাঁটুর ওপর থেকে। নিশুতি অন্ধকার। ওদিকে রূপকন্যাদের সীমানা। সারিবন্দি খাপরার চৌচালা; খালপার অবধি। প্রায় সব ঘরেই টেমি ধরানো। জ্বলছে মিটমিটিয়ে।

ডিঙির পাটাতন থেকে নীচে নেমে এ'ল নিতাই। তারপর ধীরে ধীরে খাপরা-ছাওয়া চৌচালা ঘরগুলোর পথটা ধরে।

খিল খিল করে কে যেন হেসে উঠল প্রেতায়িত গলায়। সে হাসি যেন কেটে কেটে বসে যাচ্ছে নিতাইর মনের পর্দায় পর্দায়।

অন্ধকারে ঠিকঠাক ঠাহরে আসে না।

চমকে ওঠে নিতাই, আচমকা ঠোঁট চিরে বেরিয়ে আসে—"কে, সালিনা?"

"হ গো নাগর, আমিই সালিনা।"

মেয়েটা বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে সমুখে এগিয়ে আসে।

"না, না, সালিনারে আমি চিনি।"

কেমন যেন অবশ হয়ে আসে পাথরপেশী নিতাইর সারাটা শরীর।

মেয়েটা আবারও হাসিতে ঝিলিক তোলে।

"আমিও কি কম চিনি সালিনারে?"

"তবে আমারে এট্টু চিনাইয়্যা দেও তার ঘরখান।"

নিতাইর গলায় আকূতি ফুটলো।

"আস আমার লগে।"

দু'জনে এসে একটা চৌচালা ঘরে ওঠে। ভিতর থেকে ঝাঁপটা টেনে দিতে দিতে বলে উঠল মেয়েটা—"বস নাগর, ঐ বিছানাখানে বস। আমি কুপীটা ধরাই।"

"এই কি। আমারে কই আনলা তুমি?"

"ক্যান, সালিনার ঘরে।"

খিক খিক করে হেসে ওঠে মেয়েটা, তারপর বলতে থাকে—"একটা রাইতের লেইগা আমিই না হয় সালিনা হইলাম।"

ইতিমধ্যে কুপীটা ধরানো হয়েছে। আর তারই আলোতে একবার চমকে উঠল নিতাই। সরলাকে কি এত সহজে ভোলা যায়! সোনাবঙের সেই উন্মত্ত দিনগুলো এখনও মুছে যায় নি নিতাইর চেতনা থেকে, ভাবনা থেকে, স্মৃতি থেকে।

পাঁচ-পাঁচটা বছর পেরিয়ে গিয়েছে তবু বুকটা কেমন যেন মোচড়াতে থাকে নিতাইর।

সহসা বলে ওঠে—"বউ, তুই এখানে?"

একটা খাড়া ঝিলিক যেন শিউরে শিউরে বয়ে গেল সরলার শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়ে। ককিয়ে উঠল সে—"আমার সব্বোনাশ করছে কাত্তিক।"

"আমারে ছোবল মাইর‍্যা ক্যান আইছিলি বউ?"

"কাত্তিকই তো আমারে কইছিল একেবারে রানী বানাইয়া রাখব। সুখ দিব, সোহাগ দিব, বেবাক আহ্লাদ মিটাইব।"

ধরা-ধরা গলায় বলে ওঠে সরলা।

সরলার জন্য একটা নরম সহানুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে যায় নিতাইর মনটা। সরলাই বা তার যৌবন থেকে কি ফসল তুলেছে? তার জীবনটাও তো ফালা-ফালা হয়ে গেছে। ছত্রখান হয়েছে। ছারখার হয়েছে। সহসা নিতাইর বুকে থাবাটা কেমন যেন মোলায়েম হয়ে আসে। সরলার হাত দু'টো ধরে টেনে নিয়ে এলো কাছে।

নিতাই বলে – "যা হওনের তা তো হইয়া গেছে বৌ, চল যাই আমরা আবার ঘর পাতি গিয়া কোনখানে।"

নিতাইর বন্ধন থেকে নিজেকে আলগোছে ছাড়িয়ে নেয় সরলা। বলে —"এই বেশ আছি। সারা জীবন পুরুষ চাখনের ইচ্ছাই আছে। ঘর বান্ধনের আর সাধ নাই। কার্তিক সেই সাধ মিটাইছে ভাল কইর‍্যা।"

"এই কি ভাল কথা বউ। ঘরের বউ হইয়া এই নরকে থাকন কী ভালো।"

সহসা আবার ধারালো হয়ে ওঠে সরলা —"কে বউ? সেই বউ মইর‍্যা গেছে সোনারঙ ছিল। সোয়ামীর ঘর ছাড়নের দিন।"

'আমার কি হইব?"

আকুল হয়ে ওঠে নিতাই।

'তুমি তো আর সতী বেউলা হইবা নাই। তুমিও তো এদিক-সেদিক যাওয়া আসা কর। তুমিও চাখ মাইর‍্যা।" খিল খিল করে আবারও কদর্য হাসি হেসে ওঠে সরলা। তারপর বলতে থাকে—। "একটা কাম করতে পার নাগর? মাইয়া আইন্যা দিতে পার এইখানে। বেশ মনাফা দিমু। মাইয়া প্রতি সাত কুড়ি ট্যাকা।"

এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলো নিতাই। তারপর সহসাই চোখ দু'টো ঝিলকিয়ে ওঠে তার। বলে—"দিমু, ঠিকই দিমু। ট্যাকা দে।"

"এই নাও ট্যাকা। ট্যাকা দিলাম বিশ্বাস কইর‍্যা। সেই বিশ্বাস

রাইখ্যো।" উঠে দাঁড়ালো সরলা। তারপর একটা কাঠের বাক্স থেকে সাত কুড়ি টাকা বের করে নিতাইর থাবায় গুঁজে দিল।

কপিলা-কপিলা—আচ্ছা! একটা অনাষ আগুন লেলিহ হয়ে ওঠে নিতাইর চোখের তারায়। সুদে আসলে ভুলে নেবে সারাটা যৌবনেব বঞ্চনার সব শোধ। সরলার কথাগুলো একটা উন্মাদ তুফানেব মত ভেংগে ভেংগে পড়তে থাকে নিতাইব বক্ষে।

চোদ্দ

নিতাই আবার ফিরে এসেছে রাঙামিলায়।

পদ্মা-মেঘনার ঢেউফুলগুলোর উপর দিয়ে এক মাল্লাই নৌকাটা যে ভাসিয়ে দেবে ভেবেছিল, শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠে নি। রবিশস্য বেচে রায়েবালির সঙ্গে সেও ডিঙির গলুই ঘুরিয়েছে রাঙামিলার দিকে।

বুকের তলা থেকে একটা হিংস্র সরীসৃপ কিলবিল করে উঠল একেবারে। কপিলা—হ্যাঁ তাকে ঠিকঠাক সরলার পাশেই রেখে আসবে নিতাই। তার সারাটা যৌবন ওরা দু'জনেই তো পুড়িয়ে খাক্ করে দিয়েছে ঠমক-ঠসকের আগুনে আর স্বর-গমকের জালিয়াতিতে। বুকটা ধোঁয়াতে থাকে নিতাইর।

কলাবতী আমগাছটার শাখায় শাখায় বোল ফুটেছে ফুল-মুকুলের। তারই ছায়াতলে পা ছড়িয়ে বসল নিতাই। তামাকে আজ আর জুত ধরে না। গালের পিঠে হাত দিয়ে ভাবতে থাকে নিতাই। সহসা চোখদুটো ঝকমক করে উঠল তার। যেন আগুন ঝলকাচ্ছে। কপিলা-কপিলা—

হাতের মুঠি দুটো পাকিয়ে এলো নিতাইর। কালো কালো বগগুলো ছিঁড়ে যেন রক্ত বেরিয়ে আসবে ফিন্‌কি দিয়ে।

প্রথম বসন্তের ঝিরঝিরে হাওয়া আমপাতার শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়ে শির-শির করে বয়ে চলেছে। সোনালী রোদের নেশাটা ঝিলমিল করছে ঢেউতোলা টিনের চালে চালে। অর্জুন ফুলের গাছটা

থেকে একটা পাখি ভারি তরিজুত করে গাইছে নেশা ঘন গলায়—
কুটুম্, কুটুম্, কুটুম্—
ধানের ডোলের ওপাশ থেকে রায়েবালি এগিয়ে এ'ল। বলতে থাকে
টিলে চালে—"কি, একা একা বইস্যা কর কি ?"
কোন কথা বলে না নিতাই।
রায়েবালি আবারও বলতে থাকে—"কাইল সালিনার লগে দেখা
হইল ?"
"হইচে।"
গর্জে উঠল নিতাই।
থতমত খায় রায়েবালি, তো-তো করতে থাকে, বলে—"কইল কি ?"
"কইল—থাউক —কয়েকটা দিন পরেই জানতে পারবা।"
"কেমুন, কেমুন ?" ঘন হয়ে এগিয়ে আসে রায়েবালি।
সহসা নিতাই লালাভ চোখ দু'টো তোলে, বলে—"আইচ্ছা ভাই, যুবতী
মাইয়ার মাথা দিয়ে বেনুন পাক কইর‍্যা খাইছ ?"
চমকে উঠল রায়েবালি। বলে কি নিতাই! আলগোছে একটু সরে
বসে! নিতাইর মুখচোখের আদলটা কেমন যেন বেতরিবত।
ধীরে ধীরে বলে রায়েবালি—"এযা কি একটা খাওনের বস্তু !"
"হয়, হয়, কাইল বাইতে সালিনা কইয়া দিছে কি কি মসলা দিয়ে পাক
করতে হয়, খাইতে নাকি একেবারে তোফা। একবার চাখলে জীবন-
ভর জিভ্যার আগা থিকা আর সোয়াদ যাইব না।"
আচমকা নিতাই উঠে পড়ে।
রায়েবালি বলে—"যাও কই নিতাই ভাই ?"
"এই এটু মসলাপাতির তালাসে, পাক তো করতে হইব খাসা কইর‍্যা।
না হইলে মেজবানের মজা থাকব কোনখানে ?"

"মেজবান! মেজবান কোনখানে?"
"সালিনার রঙমহল্লায়।"
একমুহূর্তও আর দাঁড়ায় না নিতাই—হন হন করে ভিতরবাড়ীর পথটা ধরে এগিয়ে চলল সে।
রায়েবালি একদৃষ্টে চেয়ে থাকে ঠায়।

কপিলা মলথাড়ু গুলো পাকা তেঁতুল দিয়ে মেজেঘষে ঝকঝকে করার তদ্বিরে ছিল। নিতাই আলগোছে এসে পিছনে দাঁড়ায়। বলে—"এক সাজি মুড়ি দিবি কপিলা, পেটে জবর পোড়ানি শুরু হইচে ক্ষুদার জ্বালায়।"
চমকে উঠল কপিলা। মুখটা তুলে পিছন দিকে চোখ দুটো ঘুরিয়ে দেয় এক পলক। বলে—"আবার ফিরা আইচস বান্দা।"
"আইলাম ত।"
নরম গলায় সায় দেয় নিতাই।
"সালিনার আথায় বুঝি আগুন নাই? মুখ পোড়াইতে শেষে বুঝি আবার এই চুলায়?" খিল খিল করে হেসে নিজের মধ্যে ভেঙে-গলে একাকার হয়ে যায় কপিলা।
"আখা একেবারে নিভ্যা গেছে সালিনার। একছিটা আঙ্গারও নাই। অনেক ভাইব্যা শেষে তোর কাছে আসছি কপিলা।"
নিতাই আলগোছে দু'টো চোখ উঁচিয়ে ধরে। গলার স্বরে এতটুকু আক্রোশ নেই।
নিতাই আবারও বলতে থাকে—"বুড়া বান্দরে কেমুন নাচায় নো তোরে?"
"তোর মুখে লাগাম নাই বান্দা। সারটা খাও তারেই আবার—"

কথাটা আর শেষ পর্যন্ত টানতে দেয় না নিতাই। ধীরে ধীরে বলে ওঠে—"সত্য কথাটা কইলে বুঝি পরাণটা চর চর কইর‍্যা ওঠে।"

কপিলা আর কোন জবাব দেয় না। মলখাড়ুগুলো পাতিলের জলে ধুয়ে আঁচল দিয়ে ঘষতে ঘষতে পাকের ঘরের দিকে চলে যায়।

খানিকটা পর একসাজি মুড়ি আর রসগুড় এনে নামিয়ে রাখে নিতাইর সুমুখে। বলে—"খা।"

সহসা নিতাই বলে ওঠে—"সেই দিন কি কইতে গেছিলি কপিলা?"

"গেছিলাম জিগাইতে রাইত কয় পহর হইচে?"

"শুধু এই-ই!"

"আর-হ, হ, কয় ছিলুম তামুক টানলি?"

"আর কিছু না?"

কপিলা ভুরুতে টঙ্কার দেয়, কল কল করে বলতে থাকে—"আর, আর মাছ খাউকা পেত্নীটায় তোর কাছে রাইতে আইস্যা পিরীতের কথা কয় কীনা, সেই খবর জানতে।"

পনের

নিশিরাত্তিরে কাশমোথরার জঙ্গল থেকে শিয়াল ডেকে ওঠে ঝাঁকে ঝাঁকে। আকাশের সামিয়ানায় অতন্দ্র তারার দীপান্বিতা। জোনাকিরা মিটমিটিয়ে জ্বলে লতাপাতার আবডালে। আর এমনি সময় নিতাই এসে ধীরে ধীরে কান পাতে কপিলার শোয়ার ঘরের বেড়ায়। শিয়রের দিক দিয়ে ঢেউ-খেলানো টিনের দেওয়াল। বাঁ কানটাকে সেই দেওয়ালে নিবিড় করে নামিয়ে আনল নিতাই। নিশুতি নিঝুম চারিদিকে। রিমঝিম করে রাত্রি ঘন হচ্ছে।

কাচের মত পরিষ্কার একটা গলার আভাস। শ্রীধর আকুল-তরল গলায় বলে—"আর এট্টু কাছে আয় নয়া বৌ।"

এই নতুন জীবনে আজকাল মনরুচি কিছুই নেই কপিলার। বিছানার এক কিনারে নিথর হয়ে পড়ে থাকে সে।

আর একটু এগিয়ে এ'ল দু'শ' কানি দোফসল জমিনের মালিক রাঙামিলার শ্রীধর মণ্ডল। বলে, আবেশ-ঘনানো গলায়—"আয় কাছে আয় আতর বৌ; আমার কপিল।"

ঝলসে ওঠে কপিলা।—"আমারে বিয়া করছিলেন ক্যান?"

ধক্ করে উঠল বুকটা, চমকে উঠল বেড়ার ওপাশের একটা কান। বলে কি কপিলা!

"ক্যান? ক্যান?"

শ্রীধর যেন একটা খাড়া ঝিলিক খেয়ে উঠে বসল। মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে তার ঝলকে ঝলকে বয়ে চলেছে তরল বিদ্যুৎ।

"ক্যান? জিগাইতে শরম লাগে না?"
কপিলা গন গন করতে থাকে।
"কি করুম বৌ।"
ছলছল করে ওঠে শ্রীধরের গলাটা।
"বিয়া না কইরা চিতার নিকাশ করলেই পারতেন। এই শ্যাষ বয়সে—"
কপিলার গলাটা লেলিহ হয়ে উঠতে থাকে ক্রমাগত। আর তার কথার আগুনে ঝলসাতে থাকে শ্রীধর মণ্ডলের মনটা।
"তোরে বড় ভালবাসি কপিলা; আমার নয়া বৌ; আয়- কাছে আয় গোলাপ বৌ। তোরে ভালবাসি বইল্যাই ত বিয়া করছি।"
সত্তর বছরের শিথিল গলায় যৌবনের বেঢপ কসরত। তরল রঙ্গরস। কণ্ঠে আবেশ ঘনাবার চেষ্টা করে শ্রীধর।
"ভালবাসা! পিরীত! আপনার পিরীতের ঠ্যালায় আমার যৌবন শ্যাষ হইয়্যা যাইতে আছে।"
কপিলার কণ্ঠটা লেলিহ হয়ে উঠেছে।
কিছু সময়ের বিরতি। একসময় শ্রীধর বলল, "তুইও তো আমারে বিয়া করছিস নয়া বৌ। তোরও তো মত আছিল। অখন যদি এত বিরক্ত হবি, তবে সেদিন তুই আমারে বিয়া করছিলি ক্যান?"
"ক্যান আবার? ভাবছিলাম আপনের সিন্দুকভরা ট্যাকা আছে, গোলা ভরা ধান আছে। সেই ধান আর ট্যাকায় আমার সব সাধসোহাগ মিটব।"
"ক্যান? ক্যান? সাধসোহাগ তোমার মিটে নাই।"
"ট্যাকা দিয়া কী সব সাধসোহাগ মিটে?"
"কোন সাধটা, কোন সোহাগটা তোর মিটল না ক' দেখি কপিল বৌ?"
"শুনতে চান!" কপিলার কণ্ঠটি আশ্চর্য হিংস্র হ'য়ে উঠেছে? "তা

হইলে শোনেন। এতখানি বয়স হইল, এতগুলি বিয়া করলেন, তবু এই বুঝ, এই বুদ্ধিটা নাই পরানে! আমার যৈবনের সাধটা মিটাইছেন আপনে? পুরাইছেন যৈবনের আশা আর আহিবক্ষাটা (আকাঙ্ক্ষা)?"

ককিয়ে উঠল শ্রীধর, "আমি কী করুম বৌ?"

"কী আবার করবেন! বুড়া বয়সে ট্যাকার সিন্দুক আর ধানের ডোল পাহারা দিবেন। আর আমারে ছাইড়্যা দেন। উটু, উটু, কইর‍্যা আমার যৈবনের আমি মাইর‍্যা ফেলাইতে পারুম না। সিধা কথটা সাফ গলায় কইয়্যা দিলাম।" টিনের দেওয়ালটাকে করাতের মত চিরে চিরে কপিলার কণ্ঠটা বেরিয়ে আসছে।

নিতাইর কানের ওপর যেন উল্কাপাত হ'চ্ছে।

"নয়া বৌ! এই কথাটা তুই কইতে পারলি?"

আর্তনাদ করে উঠল শ্রীধর।

"হ—হ। ঠিক কথাই কইছি।"

কপিলার কথাগুলো কি ধারালো। কি স্পষ্ট। কি তীক্ষ্ণ।

পুবালি চক্ররেখায় ভোরের ইশারা। নিতাই ধীরে ধীরে সরে গেল ধানের ডোলগুলোর কাছাকাছি। পাশের মুসলমান বাড়ীটা থেকে একঝাঁক মোরগের গলায় উদার সূর্য বন্দনা উচ্চকিত হয়ে উঠল।

ক-কঁর-ক, ক-কঁর-ক—

খানিকটা পর শোয়ার ঘরের দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল কপিলা। চোখেমুখে তার বিনিদ্র রাত্রির স্বাক্ষর পড়েছে। সাতের বছরের লেলিহান আগুন কি সম্ভব সত্তর বছরের এক আধবিন্দু জল দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া?

নিতাই ডাকল মোলায়েম গলায়—"কপিলা, কপিলা।"

প্রথমটা চমকে উঠেছিল ; এমন নিশিভোরে নিশিতে ডাকে না তো। এদিক সেদিক নজর ফেলল কপিলা, তারপর ধীরে চলে আসে ধানের ডোলগুলোর কাছাকাছি।

বলে—"কি রে নিতাই?"

"বুড়া বান্দরে কয় কি? তোর সোয়ামী কোন রঙ্গের কথা কয়?"

"মুখ সামাল দে বান্দা।" ঝলসে ওঠে কপিলা।

"তা না হয় দিলাম। কিন্তুক একটা কথা—"

নিতাই হাত দু'টো কচলাতে থাকে।

"কি কথা?" কপিলা ভুরু তোলে।

"তুই যা চাস তাই দিমু!" নিতাইর গলাটা কেমন যেন মন্থর হয়ে এসেছে।

"কি চাই আমি?"

"যুবতী মাইয়া যুয়ান পুরুষের কাছে যা চায়, যৌবনের সোহাগ, সাধ, আহ্লাদ বেবাক মিটামু আমি।"

"চুপ, চুপ। আমি কইয়া দিমু তোর মনিবেরে।"

"যা ক'গিয়া, আমি ডরাই না কি তোর সোয়ামীরে?"

নিতাইর গলায় কেমন একটা পৌরুষের ঘোষণা।

হঠাৎ কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। কপিলার সমস্ত দেহটা যেন একরাশ উত্তপ্ত মোমের মত ভেঙেচুরে, গলে মিশে যেতে চাইল নিতাইর বিশাল বুকটায়। সবচেয়ে পুরাতন আবেগ সবচেয়ে নতুন আবেশে কথা কয়ে উঠল, হৃৎপিণ্ড দু'টি থর থর করে বাজল।

থর থর গলায় কপিলা বলল, "ডরাইস না তোর মনিবেরে!"

"কে কার মনিব! আমারে বান্দা রাখে এমুন বাদশা দুনিয়ায়

জন্মায় নাই।"

একটু থামল নিতাই। তারপর আশ্চর্য ঋজু গলায় বলল, "আইজ রাইতে আমি যামু গিয়া। তোরেও আমার লগেই লইয়্যা যামু।"

"আমারেও লইয়্যা যাবি!" বলতে বলতে উদ্দাম বেষ্টনে নিতাইকে জড়িয়ে ধরল কপিলা। তারপর ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, "এতদিন এই জোর কোথায় আছিল তোর নিতাই? এই কথাটা এতদিন কইস নাই ক্যান? বোঝস না, মাইয়া মানুষে পুরুষের সাহস দেখতে ভালবাসে। জোর জবরদস্তিরে পিরীত করে।"

"আগে জানতাম না। অনেক ঠেইক্যা, পরাণে অনেক ঘাই খাইয়্যা আইজ এই সত্যটা বুঝলাম।"

"আমি তোরে ভালবাসি নিতাই। বুড়া শয়তানের কাছে আর একটা দিনও আমি থাকুম না। তোর লগেই আমারে নে।"

"বেশ আইজ রাইতেই মেঘনার ঐ পারে যামু গিয়া আমরা।"

"বেশ।"

মোথরা ঝোপের পাশ থেকে মোরগগুলো আবার ডেকে উঠল। ক-কঁর-ক, ক-কঁর-ক।

নিতাই আর কপিলা সরে গেল দু'পাশে।

ষোল

মাঝরাত্তিরে পাশের বালিশটাকে আর একটু সামনে টেনে নিয়ে এলো শ্রীধর। ঘুমজড়ানো গলায় বিড় বিড় করে বলতে থাকে সে, "আর একটু কাছে আয় কপিল বৌ। আমার পরাণে আর দাগা দিস না। তোরে বড় ভালবাসি আমি।"

আর এমনি সময় মেঘনার ঢেউ চিরে চিরে নিতাইর কোষ ডিঙিটাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। মুখোমুখি বসে রয়েছে কপিলা।

নিতাইর কোমরে কাঁচা টাকা গুলি ঝন ঝন বাজছে। সেদিন সবলা বায়না দিয়েছিল। বেসাতির জন্যে নারীদেহ এনে দিতে হবে। কর্তব্য তার স্থির হয়ে গিয়েছে। যৌবনের দম্ভে, যৌবনের দিশাহারা গৌরবে আর গর্বে কপিলা তাকে অনেকবারই অবজ্ঞার অতলান্তে ফেলে দিয়েছে। তার মুঠিতে জ্বালাভরা প্রত্যাখান তুলে দিয়েছে। কিন্তু আজ—আজ—হ্যাঁ, সবলা আর কপিলা পাশাপাশিই থাকবে। দু'জনেই তো যৌবনের আর ঠমকঠমকের জালিয়াতিতে তাকে প্রতারিত করেছে। বিভ্রান্ত করেছে।

নৌকাটা চরজলমার গঞ্জের কাছাকাছি এসে পড়েছে। আচমকা নিতাইর দৃষ্টি চমকে উঠল। কপিলার সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা নেই। কী নিরাভরণ, কী শুভ্র দেখাচ্ছে কপিলার সিঁথিপথ। মনিবন্ধে শাঁখ-দু'টিও নেই।

কোথা দিয়ে কী যেন হয়ে গেল। একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পের দোলা লেগে মেঘনার উত্তাল দেহটা দুলে উঠছে। আর দুলছে নিতাইর চেতনা।

কপিলা তো তাকে ঘিরে সকল কামনা আর বাসনাকে সতেজ তেলাকুচ লতার মত লতিয়ে দেবার জন্যই ঘর ছেড়েছে। ছেড়েছে শ্রীধরের সোহাগ-আহ্লাদ। শ্রীধর নামে নিশ্চিন্ত আর নিবিপদ একটি কূল ছেড়ে নিতাই নামে একটি অনিশ্চিত স্রোতে ঝাঁপ দিয়েছে। ঝাঁপ দিয়েছে কিনারাহীন, তলহীন এক উদ্দাম বন্যায়।

আচমকা চরজলমার গঞ্জের কোলে নাও ভিড়িয়ে নিতাই ওপরে উঠে এল। একবার নজর ফেলল রূপকন্যাদের খাপরা-ছাওয়া চৌচালাগুলোর দিকে। তারপর হন হন করে চলে এল উত্তরমুখো। চেনাশোনা একজন দোকানী ছিল, তাকে ডেকে তুলল নিতাই—"এট্টু সিন্দুর আর দুই গাছা শাঁখা দাও তো ব্যাপারী ভাই।"
"এত রাইতে শাঁখা-সিন্দুর!"
দোকানীর তন্দ্রাবিজড়িত গলায় বিস্ময় স্পন্দিত হল।
"কাম আছে, বড় পুণ্যের কাম।"

নৌকায় এসে শাঁখা-সিঁদুরের সঙ্গে নিতাই মনের মাধুরী জড়িয়ে দিল কপিলার মণিবন্ধে আর কপাল-সিঁথিতে।
আবার এগিয়ে চলল নৌকাটি। অনেকদিন পর নিতাইর নৌকার পালে সোনারঙের বাতাস লেগেছে।
সরলার ঝড়ে যে ঘর ভেঙে গিয়েছিল, পাঁচ বছর পর কপিলার সোহাগ দিয়ে তার ছাউনি দেবে নিতাই। ভিটেটা পোক্ত করে নেবে নিভেজাল প্রেমে।
কপিলা আর একটু এগিয়ে এল সুমুখে। বলল—"তোর সেই গানটা গা দেখি নিতাই। বড় মিঠা, বড় সোন্দর।"

এক হাতে হালের বৈঠাটা চেপে আর একটি হাত কানের ওপর রেখে নিতাই আকুলগলায় গানটা ধরল :

"হিজল ফুলের মালা গাইথ্যা হে সুন্দরী
দিব তোমার গলেতে—
হে সোনার বরণ রাজকইন্যা।
ময়ূর পঙ্খী নাও ভিড়িল ঘাটে গো—"

অনেকদূরের জলদিগন্ত থেকে নিতাইর আকুল নেশার গানটা কি এখন শ্রীধরের কানে গিয়ে পৌছবে? কে জানে?

শুধু নিতাইর মুখের দিকে তাকিয়ে কপিলা ভাবছে, নিতাই নামে যে বন্দরে এতকাল সে নোঙর ফেলতে চেয়েছিল, সেই দূরের বন্দরটা এখন কত নিবিড় হয়েছে! কত ঘনিষ্ঠ হয়েছে! কত কাছে এসে পড়েছে। কপিলা ভাবছে, অনেক, অনেক ভাবনার ঢেউ ঠেলে, অনেক মোহ আর বিভ্রান্তি উজিয়ে সেই বন্দরে সে পৌছেছে। নিতাই নামে যৌবনের সেই বন্দরে কী শান্তি কী মুক্তি! কী আনন্দ!

— সমাপ্ত —